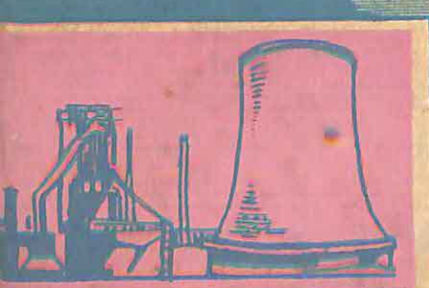
বঙ্গ আমার









অমরনাথ রায়


বঙ্গ আমার

প্রকাশক :
শ্রীঅধীরচন্দ্র [redacted] চক্রবর্তী
[redacted] প্রত্যয় প্রকাশ
[redacted]
১৭/২, হারাধন কুণ্ডু লেন, হাওড়া - ১

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ৮ই জুন ১৯৬৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৮
চতুর্থ মুদ্রণ : ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯
পঞ্চম মুদ্রণ : ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী

গ্রন্থসজ্জা :
শ্রীব্রজ রায়চৌধুরী
শ্রীযুধাজিৎ

BANGA AMAR by Amar Nath Ray

ভূমিকা

আমরা ভারতের অধিবাসী—ভারতবাসী। এইটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আমরা জন্মেছি বাংলাদেশে। কাজেই ভারতবর্ষের পরিচয় যেমন আমাদের জানা দরকার, তেমনি জানা দরকার জন্মভূমি বঙ্গদেশের পরিচয়। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে গেলে বিরাট কলেবর একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটানো সহজসাধ্য নয়। তাই আমাদের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যেটুকু জানানো একান্ত প্রয়োজন বোধ করেছি, তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রচনা করেছি 'বঙ্গ আমার'।

'বঙ্গ আমার' রচনাকালে আমি প্রধানত পশ্চিম বাংলাকেই আমার চোখের সামনে ধরে রেখেছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অবিভক্ত বাংলার কথা অর্থাৎ পূর্ব বাংলার কথাও আপনা আপনিই এসে পড়েছে এবং তার আলোচনাও করেছি। এখন পাঠকদের ভাল লাগলেই এ গ্রন্থ রচনার শ্রম সার্থক মনে করব।

রায়পাড়া,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
খ্রীষ্ট-জন্মদিবস, ১৯৬৬

অমরনাথ রায়

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়	৩
বাংলার অধিবাসী—বাঙ্গালী	৯
বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামী	১৫
বাংলার রাজধানী—কলকাতা	২৬
বালার ভাষা ও লিপি	৩৫
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	৪৪
বাংলার বিজ্ঞান-সাধনা	৫৯
বাংলার তীর্থক্ষেত্র	৬৬
বাংলার দর্শনীয় স্থান ও বস্তু	৭৫
বাংলার বাউল	৭৯
বাংলার লোকসঙ্গীত	৮৬
বাংলার লোকনৃত্য	৯৭
বাংলার মন্দির	১০৪
বাংলার উৎসব	১১২
বাংলার মেলা	১২৮
বাংলার শিল্পকলা	১৩৮
বাংলার সাধক	১৪৯
বাংলার সংস্কৃতি	১৬০



বঙ্গ আমার! জননি আমার!
    ধাত্রি আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন,
    কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
    কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার
    ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'—
...   .
যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে
    ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরীমা
    ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য!
    মানুষ আমরা নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার!
    স্বর্গ আমার। আমার দেশ!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

'বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!'

—বিশ্বকবির সঙ্গে আমরাও বাংলার বন্দনা গান গাই।

আমাদের এই বঙ্গদেশের রূপ বড় সুন্দর। এর ভূ-সংস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন বড় বৈচিত্র্যময়। এ রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে তুষার শুভ্র হিমালয় পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এর পদপ্রান্ত স্পর্শ করে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর। এ রাজ্যের পূর্বদিকে বাংলাদেশ আর পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা। হিমালয়ের দক্ষিণে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গের বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র।

গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী পশ্চিম বঙ্গের সমভূমিকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যময় অংশে ভাগ করেছে। গঙ্গার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ। রাজ্যের এ অংশের ঢাল দক্ষিণমুখী। পশ্চিম দিনাজপুর বৈচিত্র্যহীন সমতলক্ষেত্র। মালদহের পূর্বাঞ্চল 'বারেন্দ্রভূমি' নামে পরিচিত। এটি রূক্ষ এবং উচ্চভূমি। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে এই অঞ্চল বহু প্রাচীন। মহানন্দা নদীর পশ্চিম দিকে 'তাল অঞ্চল'। তাল অঞ্চল বন্যা-প্লাবিত অঞ্চল। আর মহানন্দার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে নতুন পলিমাটিদিয়ে গড়া 'দিয়ারা অঞ্চল'। দিয়ারা হচ্ছে রেশমকীটের খাদ্য তুঁতে গাছের দেশ। এ গেল প্রথম ভাগের কথা।

গঙ্গার দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের সমভূমির দ্বিতীয় ভাগ অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্যে আছে চব্বিশ-পরগনা, কলকাতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের অর্ধাংশ।

ভাগীরথীর পশ্চিমদিকের ভূভাগ আগেকার দিনে 'রাঢ় অঞ্চল' নামে অভিহিত হতো। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের পশ্চিম-দিক এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু।

হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিম বঙ্গ গড়ে উঠেছে দার্জিলিং, জলপাই-গুড়ি ও কোচবিহার জেলা নিয়ে। এ অঞ্চলের উত্তরে সিকিম ও ভূটান। এখানকার পাহাড়গুলি সাধারণত ১,৮০০ থেকে ৩,০০০ মিটার উঁচু। এই পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশের অরণ্যানী 'তরাই' নামে পরিচিত। আর শিলিগুড়ি মহকুমা ও কার্শিয়াং-এর পূর্বাংশের সংকীর্ণ অঞ্চল 'দার্জিলিং তরাই' নামে পরিচিত।

কোচবিহারের উত্তর, কালিম্পং ও ভূটানের দক্ষিণ এবং তিস্তা ও সংকোশ নদীর মাঝখানের জায়গাটি 'ডুয়ার্স' নামে পরিচিত। অরণ্য, নদী, বিচ্ছিন্ন পাহাড়, সংকীর্ণ উপত্যকা এবং কর্ষণযোগ্য সমভূমি—এইগুলিই ডুয়ার্স অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে বিখ্যাত সুন্দরবন। এখানে নিম্নভূমি আর কতক জলাভূমি। আর এখানে আছে বহু উপহ্রদ ও অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ।

মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনা জেলার দক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ উপকূল অঞ্চল। এই উপকূল অঞ্চলে রয়েছে বহু নদীর মোহনা, খাড়ি এবং সাগরদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ। পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নবীন।

বঙ্গদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের মধ্য দিয়ে বহু নদ-নদী

বয়ে গেছে। গঙ্গা নদীর কিছু অংশ এ রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এই নদীটি পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম অংশে পৌঁছুবার পরই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। গঙ্গার পূর্ব শাখা পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে



পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ

চলে গেছে। আর মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে গঙ্গার যে পশ্চিম শাখা বেরিয়েছে, তারই নাম ভাগীরথী। ভাগীরথী এ রাজ্যের সর্বপ্রধান নদী। কলকাতা ও চব্বিশ-পরগনার পাশ দিয়ে ভাগীরথীর যে অংশ বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে—সেটা হুগলী নদী। হুগলী

নদী কলকাতার কেন—গোটা পশ্চিমবঙ্গেরই প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। এই নদীর দুপারে এ রাজ্যের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি অবস্থিত।

ছোটনাগপুরের পাহাড় হতে দামোদরের উৎপত্তি। পশ্চিম বঙ্গের এই প্রসিদ্ধ নদী বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলীর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। বরাকরসহ এর উপনদী নয়টি। আবার বরাকরের উপনদী পাঁচটি। কাজেই মোট চৌদ্দটি নদীর বিপুল জলধারা বইতে হয় দামোদরকে।

দামোদরের মত অজয়ও উৎপন্ন হয়েছে ছোটনাগপুরের পাহাড় হতে। দামোদর বর্ধমান ও বীরভূমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে মিশেছে। এই ছোটনাগপুরের পাহাড় হতে আরও তিনটি নদী—রূপনারায়ণ, কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রথম দুটি মিশেছে ভাগীরথীতে। শেষেরটি উড়িষ্যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

নগাধিরাজ হিমালয় বারেটি নদীর উৎপত্তিস্থল। তিস্তা উৎপন্ন হয়েছে সিকিমের এক হিমপ্রবাহ হতে আর মহানন্দা দার্জিলিং পাহাড় হতে—এরা তো বটেই, আরও অনেক ছোট-বড় নদী হিমালয় হতে নেমেছে। নেমে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে গেছে। এইসব নদ-নদী বাংলার প্রাণ। এদের বয়ে আনা পলিমাটি পশ্চিম বাংলাকে শস্য-শ্যামলা করেছে।

পশ্চিম বঙ্গের প্রায় মাঝখানটি দিয়ে চলে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। একদিকে সমুদ্র খুব কাছে, অন্যদিকে বৃষ্টিপাত প্রচুর। এই দুই কারণে এ রাজ্যে বেশী শীত বা বেশী গ্রীষ্ম অনুভুত হয় না। এ রাজ্যের জলবায়ু উষ্ণ ও আদ্র। এমন জলবায়ুকে স্বাস্থ্যকর জলবায়ু বলা চলে না। কারণ এ জলবায়ু মানুষের কর্মস্পৃহাকে কমিয়ে দেয়। ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্যন্ত এ রাজ্যে গ্রীষ্মকাল।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমী বায়ু এ রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তার ফলে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ঐ বায়ুপ্রবাহের সূচনাতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রায়ই বিকালের দিকে কাল-বৈশাখার ঝড় হয়।

গ্রীষ্মকালের ঐ মৌসুমী বায়ু দীর্ঘদিন এ রাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস থেকে, ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ই এ রাজ্যের বর্ষাকাল।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে এ রাজ্যের উপর দিয়ে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। তখনও মাঝে মাঝে ঝড় দেখা যায়। শীত পড়ে কার্তিক মাস থেকে। শীতকালে দার্জিলিঙে কখনও কখনও তুষারপাত হয়। দার্জিলিঙে তীব্র শীত পড়ে। মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগনা জেলা সমুদ্র-উপকূলে অবস্থিত বলে এই দুই জেলায় শীত ও গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া চরম নয়। অপরদিকে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশে শীত ও গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন—বৃষ্টিপাতও কম।

এদেশের শতকরা ষাট ভাগ জমিতে কোন না কোন ফসল উৎপন্ন হয়। সব জেলাতেই অল্প-বিস্তর ধানের চাষ হয়। তবে মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতে ধানের চাষ বেশী পরিমাণে হয়। ধানের মত পাটও এ রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই অল্প-বিস্তর জন্মে। তবে পাট বেশী জন্মে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ-পরগনা, মালদহ, কোচবিহার, হুগলী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাতে।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার উচ্চভূমিতে ভাল চা জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে আখ, তামাক, নানারকম

তৈলবীজ ও ডাল উৎপন্ন হয় এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে যথেষ্ট কমলালেবু ও সিন্‌কোনার চাষ হয়। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় খুব ভাল আম জন্মে। এ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তিসি, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজের চাষ বেশ ভালভাবেই হয়। তবে ভুট্টা ও গম সামান্য পরিমাণেই উৎপন্ন হয়।

কয়লাই বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র খনিজ সম্পদ। বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে রানীগঞ্জ ও আসানসোলের আশেপাশে প্রায় পাঁচশো বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের দুশোর মত কয়লার খনি থেকে ভারতের শতকরা তিরিশ ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়।

এ রাজ্যের ষোলটি জেলা তিনটি প্রশাসনিক-ভুক্তির অন্তর্গত। জলপাইগুড়ি-ভুক্তির অধীনে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার পশ্চিমদিনাজপুর ও মালদহ জেলা; প্রেসিডেন্সি-ভুক্তির অধীনে —হাওড়া, চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা জেলা; আর বর্ধমান-ভুক্তির অধীন আছে—বর্ধমান, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা। কলকাতা বাদে পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলি ৪৭টি মহকুমা ও ৩০৩টি থানায় বিভক্ত। ছোট-বড়য় মিলে মোট ১৮৪টি শহর আছে এ রাজ্যে। তার মধ্যে একলক্ষের বেশী জন-বসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা এগারটি। লোকবসতির দিক থেকে বিচার করলে চব্বিশপরগনা সবচেয়ে বড় ও দার্জিলিং সবচেয়ে ছোট জেলা।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা হচ্ছে ৪,৪৪,৪০,০৯৫ জন—পুরুষ ২,৩৪,৮৮,২৪৪ জন ও স্ত্রীলোক ২,০৯,৫১,৮৫১ জন। এখানকার তিন-চতুর্থাংশ লোক গ্রামের বাসিন্দা। এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১০২১জন লোক বাস করে।

বাংলার অধিবাসী — বাঙালী

'সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'

—কবির এ উক্তি সত্য। আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ আমাদের বাঞ্ছিত ভূমি। কিন্তু এই বাঞ্ছিত ভূমিতে ঠিক কবে থেকে যে মানুষের বসতি শুরু হয়েছে তা বলা শক্ত।

অতীতের মানুষ পাথরে গড়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। এই সব অস্ত্রই অতীতকালের মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ ও পরিচয় দেয়। এই যে পাথরে গড়া অস্ত্র—এদের দু-ভাগে ভাগ করা যায়। অতি প্রাচীনকালের মানুষ বাস করত 'প্রত্ন-প্রস্তর যুগে'। তারা যে সব পাষাণ-অস্ত্র ব্যবহার করত সেগুলোর গড়নে বিশেষ কোন কৌশল বা পারিপাট্য ছিল না। পরবর্তীকালে এই সব অস্ত্রে পালিশ দেখা যায়। অস্ত্রগুলি সুগঠিতও হয়। পরবর্তী যুগের নাম দেওয়া হয় 'নব্য-প্রস্তর যুগ'। এ যুগে মানুষের সভ্যতা আগেকার চেয়ে কিছুটা উন্নত হয়। এ যুগের মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে—শেখে পোড়ামাটির বাসন তৈরি করতে। আর শেখে রান্নার প্রণালী।

নব্য-প্রস্তর যুগেরও অনেক পরে মানুষ ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা প্রথমে তামা দিয়ে গড়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। সেইজন্য এই তৃতীয় যুগকে বলা হয় 'তাম্র-যুগ'। তাম্র-যুগের পর মানুষ লোহার সঙ্গে পরিচিত হয়। ধীরে ধীরে সে আরও উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হয়।

এমনিভাবে বঙ্গদেশেও মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল। এ দেশেও প্রত্ন-প্রস্তর যুগ, নব্য-প্রস্তর যুগ এবং তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। তার থেকে বোঝা গেছে কতো প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে মানুষ বসবাস করত। আর তারা কতটা সভ্য ছিল।

মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী অনুশীলন করে নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের জাতি স্থির করে থাকেন। মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অনুসারে জগতের সব মানুষকে তাঁরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। নৃতত্ত্ববিদের মতে বাঙ্গালী জাতি সৃষ্টির মূলে আছে চারটি বিভিন্ন মূল জাতির উপাদান ঃ

১। লম্বা আর উঁচু মাথাওয়ালা একটি জাতি। এ জাতি আর্যভাষী। বাংলা দেশে এই রকম লম্বা আর উঁচু মাথাওয়ালা লোক বেশী মেলে না। মেলে অতি অল্পস্বল্প।

২। লম্বা আর নীচু মাথাওয়ালা জাতি। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষীরা এবং কোলজাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গদেশের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই রকম লম্বা ও নীচু মাথাওয়ালা লোক কিছু কিছু পাওয়া যায়।

৩। গোল মাথাওয়ালা জাতি। এদের ইংরেজীতে বলা হয় 'অ্যালপাইন শর্ট হেড্‌স'। বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর মানুষই বেশী। এ রকম গোল মাথাওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহু দেশেই দেখা যায়।

৪। গোল মাথাওয়ালা আর একটি জাতি—নাম 'মঙ্গোলিয়ান শর্ট হেড্‌স'। এরা মোঙ্গল জাতীয় লোক। নাক চেপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফদাড়ি কম। উত্তর ও পূর্ববাংলার লোকেদের মধ্যে এই জাতির উপাদান বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে এই চার রকম মৌলিক জাতির মিশ্রণে আধুনিক বাঙ্গালী জাতি গড়ে উঠেছে। নৃতত্ত্ববিদ্যার এই আবিষ্কারের উদ্দেশ্য মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে তার মৌলিক জাত স্থির করা। এ আবিষ্কারের সঙ্গে জাতির ভাষা বা সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা ভাষাকে বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আর্যরা এদেশে আসবার আগে এখানে বিভিন্ন জাতির লোক বসবাস করত। নৃতত্ত্ববিদেরাও বর্তমান বাঙ্গালীর দৈহিক গড়ন পরীক্ষা করে পণ্ডিতদের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন।

আর্যরা বঙ্গদেশে আসবার আগে বাঙ্গালীরা অনার্য ভাষায় কথা বলত। তখনকার দিনের বঙ্গদেশে দ্রাবিড় ভাষা, কোল ভাষা এবং ভোট-চীনা ভাষার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। এগুলি অনার্যজাতির ভাষা। আজ বঙ্গদেশে কোল, শবর, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অনেক অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়। এরাই বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যভাষীদের বংশধর। এরা অস্ট্রিক মানবগোষ্ঠীর বংশধর। কেউ কেউ এদের নিষাদ জাতিও বলে থাকেন।

বাংলার প্রাচীন নিষাদ জাতি গ্রামে বাস করত। চাষবাস করে জীবনধারণ করত। নব্য-প্রস্তর যুগের লোক হলেও তারা ক্রমে তামা ও লোহার ব্যবহার শিখেছিল। সমতলে ও পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে ধান উৎপাদন প্রণালী তাদেরই আবিষ্কার। ধান ছাড়া কলা, নারকেল, পান, সুপারি প্রভৃতিও তারা উৎপাদন করত। তারা গরু চরাত না, গরুর দুধও খেত না তবে মুরগি পুষতো। কুড়ি হিসাবে গণনার ধারা এদেশে তারাই চালু করেছিল। চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিন-রাত্রি মাপবার পদ্ধতিও চালু করেছিল।

আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ থেকে আমরা জানতে পারি

আর্য ও অনার্যজাতির কথা। আর্যরা ভারতে আসার আগে ভারতে দুটি বড় অনার্যজাতি বাস করত। তারা হচ্ছে দ্রাবিড় আর কোল। যাই হোক আর্যরা ভারতে এলো তাদের বৈদিক ভাষা নিয়ে, বেদের মন্ত্র নিয়ে—নিয়ে তাদের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি। ভারতে এসে প্রথমে তারা পাঞ্জাবে বসবাস শুরু করল।

পাঞ্জাব দেশটা তখন কিন্তু জনবসতি শূন্য ছিল না। সেখানে অনার্য দ্রাবিড় জাতির লোকেরা বসবাস করত। আর্যরা আসতেই আর্য-অনার্য সংঘাত ঘটলো। সংঘাতে জয়ী হলো আর্যরাই। কাজেই তারা অনার্যদের রাজা হয়ে বসল।

আর্যদের এই তীব্র আক্রমণে অনার্যদের জাতীয় সংহতি নষ্ট হলো। তারা আর্যদের প্রভু বলে মেনে নিল। নিল আর্যদের ভাষা ও ধর্ম।

এদিকে আর্যরা ছিল সংখ্যায় কম। তারাও অনার্যদের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারল না। অনার্যদের ধর্ম ও মনোভাবের প্রভাব পড়ল আর্যদের মধ্যে। তারা অনার্যদের ভাষার অনেক শব্দ গ্রহণ করল। আবার অনার্যরাও আর্যদের ভাষা গ্রহণ করল। অনার্যদের মুখে মুখে আর্য ভাষা কিছুটা বদলে গেল। ফলে আর্যভাষা আর তার বিশুদ্ধি বজায় রাখতে পারল না।

ঋগ্বেদের যুগ পর্যন্ত আর্যরা পাঞ্জাবেই রইলো। রইলো তাদের ভাষা নিয়ে, তাদের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে। তারপর আর্যরা উত্তর ভারতে বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এই সময়ে বেদের মন্ত্র রচনার যুগের অবসান ঘটলো। এলো ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যুগ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল বেদের মন্ত্র আলোচনা, যজ্ঞ সম্পর্কিত নানান্ তত্ত্ব। আর ছিল কিছু কিংবদন্তী।

আর্যরা ভারতে বসতি বিস্তার করল। ফলে ভারতের অনার্যেরা অর্থাৎ দ্রাবিড় ও কোলেরা তাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলো—আর্যভাষা ও আর্যধর্ম মেনে নিল। অনার্যেরা আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ যুগের শেষ ভাগে এলো আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ। তারপর বুদ্ধদেব ও মহাবীর যুগ। বেদ ও ব্রাহ্মণের যুগের কথা তো বাদই দিলাম, আরণ্যক-উপনিষদ এমনকি বুদ্ধদেবের যুগেও আর্যরা বাংলা দেশে আসেনি।

বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালে রচিত হয় বৌধায়ন ধর্মসূত্র। তাতে বলা হয়েছে যে উত্তর ভারতের আর্য-ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এলে তাঁকে স্বদেশে ফিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। অনার্য দেশ বলে বাংলার প্রতি উত্তর ভারতের আর্যরা তখন এমনই বিরূপ ছিল। তখনকার দিনে বাংলার আর একটা বদনাম ছিল। এখানকার লোকেরা নাকি স্বভাবতই বড় রূঢ় ও অভদ্র ছিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় ও সুহ্ম দেশে অর্থাৎ সেকালের পশ্চিম বঙ্গে ভ্রমণে এসেছিলেন। জৈনদের প্রাচীন গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে সেই সময় রাঢ় ও সুহ্ম দেশের লোকেরা তাঁকে প্রহার করেছিল। মুখে চু-চু শব্দ করে পথের কুকুরগুলিকে উত্তেজিত করে তাঁর দিকে লেলিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে আর্যরা চলে আসেন মগধ দেশে। মৌর্যরা বঙ্গদেশ জয় করে আর্যাবর্তের সঙ্গে বঙ্গের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করেন। তাঁদের যুগ থেকেই মগধের রাজকর্মচারী, সৈনিক, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষ বঙ্গদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তখন রাজশক্তির প্রভাবে বঙ্গদেশে আর্যভাষা প্রচারিত হয়। সেই প্রথম আর্যরা আসে বঙ্গে—আর্যভাষা আসে বঙ্গদেশে।

বাংলার অনার্যরা সবরকমভাবে আর্য-সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু তাদের 'খোকা-খুকি' ডাক, বাঙ্গালী মেয়েদের শাড়ি, সিঁদুর ও পান-হলুদ ব্যবহার রয়ে যায়। রয়ে যায় বাঙ্গালীর কালীপূজা ও শিবের গাজন। এ সব আজও সেই অনার্য যুগের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

সেই মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে হিউয়েন-সাঙের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক—এই কয়শ' বছরের মধ্যে বাঙ্গালী বলে একটি বিশিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে। কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল প্রভৃতি অনার্যদের যেন এক কড়ায় গালিয়ে আর্যভাষা, আর্য সভ্যতা আর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ছাঁচে ফেলে আমাদের পূর্বপুরুষ বা এই আদি বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হয়েছে।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে দৈহিক গড়নে সাধারণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাংলার ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, নমঃশূদ্র প্রভৃতির যতটা মিল দেখা যায়, আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদেরও ততটা মিল নেই। এর থেকে এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে বাংলার অধিবাসীরা আর্যজাতির বংশসম্ভূত নন। বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে গড়ে উঠলেও বাঙ্গালী কিন্তু একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি।

বাংলার প্রাচীন অনার্যজাতির মধ্যে বৈদিক হোম ও যাগ যজ্ঞের বিরোধী পূজা-প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল অনেক লৌকিক মত ও আচার-অনুষ্ঠান। বিয়ের সময় তারা হলুদ, সিঁদুর প্রভৃতি ব্যবহার করত। কাজেই আর্যদের সংস্পর্শে আসবার আগেই যে আদিম বাঙ্গালী-জাতি এক বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা ও বাঙ্গালীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দেশ মাতৃকার বন্ধন-শৃঙ্খল মোচনের জন্য স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীরা জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, নির্যাতন ভোগ করছেন, দুঃসহ কারাবাসে গেছেন, নিদারুণ নির্বাসনে থেকেছেন, ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। এইসব অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, তপস্যা এবং সংগ্রামের কাহিনীতে এই ইতিহাস সমুজ্জ্বল।

২৩শে জুন ১৭৫৭ঃ পলাশীর রক্তরঞ্জিত প্রান্তরে অস্ত গেল আমাদের স্বাধীনতা সূর্য। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। ব্যবসা করতে এসে ইংরেজ এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে বসল।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল আমাদের দেশীয় সৈনিকরা। ইংরেজরা তাকে বলে—'সিপাহী বিদ্রোহ'। ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা বলেন ভারতীয় মহাবিদ্রোহ। স্থির ছিল ঃ ২৩শে জুন ১৮৫৭ পলাশী-যুদ্ধের শতবার্ষিকী দিবসে সারা ভারতব্যাপী সিপাহীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং বিপ্লব শুরু হবে—বিদেশী শাসক ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য।

কিন্তু ২৯শে মার্চ ১৮৫৭ঃ বাংলার বারাকপুরের অশান্ত অস্থির বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পদাতিক বাহিনীর সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকের ভিতরেই একজন ইংরেজ-সেনানায়ককে গুলি করে হত্যা করল। সাতদিন পরে মঙ্গলের ফাঁসী হল। মঙ্গল পাণ্ডে হল শহীদ। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের

আগুন জ্বলে উঠল সারা ভারতে। এই বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০-৬১ সালে হল বাংলার নীল বিদ্রোহ। ইংরেজ নীলকর সাহেবরা মুনাফার জন্য জোর করে চাষীদের নিয়ে খাদ্যশস্যের বদলে এদেশে নীলের চাষ করাতে স্বরু করল। তারা দরিদ্র চাষীদের উপর করল অমানুষিক অত্যাচার। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সেই অত্যাচারের দর্পন। ক্ষতিগ্রস্ত নিপীড়িত চাষীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এইসব অসহায় মানুষদের সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন শহীদ দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, মেঘাই সর্দার, দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বনাথ প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে দেশে জনজাগরণ দেখা দিল। এই জনজাগরণের পুরোহিত হলেন রাজা রামমোহন রায়।

বাঙ্গালীরা গড়ে তুললেন হিন্দুমেলা, ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স, ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি।

১৮৮৫ সালে স্থাপিত হল কংগ্রেস।

প্রথম সভাপতি হলেন বাংলার সন্তান উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নেতারা খবরের কাগজে লিখে ও সভায় বক্তৃতা দিয়ে বৃটিশ শাসনের দোষ কোথায় তা দেখিয়ে দিতে লাগলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন।

এমনিভাবে এল ১৯০৫ সাল।

স্বাধীনতা চেতনায় জাগ্রত সংহত বঙ্গদেশকে ভেঙ্গে দু' টুকরো করে দিতে চাইল চতুর ইংরেজ প্রশাসক লর্ড কার্জন।

এর বিরুদ্ধে আন্দোলন স্বরু হল। সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ

আন্দোলন 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে আজ যা ইতিহাসখ্যাত। সারা দেশে জাগল জোয়ার: বাংলাদেশকে ভাগ হতে দেব না।

১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ঃ রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন রাখী-বন্ধনের। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অরন্ধনের—উপবাসের। কৃষ্ণকুমার মিত্র বিলেতী জিনিস বয়কটের এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সর্বাত্মক হরতালের। শতশত দেশাত্ম-বোধক সংগীত রচিত হলো এই উপলক্ষে।



সুরেন্দ্রনাথ

বাংলাদেশ পরিণত হল আগুনের স্তূপে। কথায় ও কাজে বাঙ্গালী উন্মত্ত হয়ে উঠল—সভা করে, শোভাযাত্রা করে প্রতিবাদ জানাতে।

১৯০৬ সালঃ বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশের নির্মম লাঠি চার্জ সত্ত্বেও সকলে নির্ভয়ে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে লাগল। ধরাশায়ী হল, তবু পালাল না। বে-আইনী জন সমাবেশের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সুরেন্দ্রনাথের দুশো টাকা জরিমানা হল। কয়েক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে চলছিল বিপ্লবী দলের সংগঠন, সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন। পি. সি. মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন 'অনুশীলন সমিতি', বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও অনুকূল মুখোপাধ্যায় গড়ে তুললেন 'আত্মোন্নতি সমিতি', হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের 'সুহৃদ ও সাধনা সমিতি', অশ্বিনীকুমার দত্ত ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি', ঢাকায় পুলিন দাসের সংগঠন এবং পরে যুগান্তর পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'যুগান্তর' দল।

এই সব দলগুলির মন্ত্রণাদাতা ছিলেন 'অগ্নিযুগের ব্রহ্মা' যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)। আর নাম করা যেতে পারে ভগিনী নিবেদিতার। সংগঠনের নেতৃত্বপদে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর


শ্রীঅরবিন্দ

ভাই বারীন ঘোষ প্রভৃতি। তিন খানি পত্রিকা (শ্রী অরবিন্দ সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা', এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'যুগান্তর') বিপ্লবমন্ত্রের আগুন জ্বালাতে লাগল।

যুগান্তর দল বাংলার সমস্ত গুপ্ত সমিতিগুলিকে এক করলেন। মানিকতলায় গড়ে উঠল বোমা-পিস্তল তৈরীর কারখানা। হেমচন্দ্র কানুনগো বোমা তৈরী শেখাতেন।

বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা : ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার ছোটলাট বামফিল্ড ফুলারের ট্রেন বোমা মেরে ধ্বংসের আয়োজন। বোমা বিস্ফোরণ হল, তবে ট্রেনটি রক্ষা পেল।

তারপর কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিংসফোর্ড যখন কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট তখন এক বালককে অন্যায়ভাবে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। এজন্য তাকে হত্যা করার আয়োজন করা হয়। বৈপ্লবিক সমিতির নির্দেশে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী গেলেন হত্যা করতে। কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে ভুল করে মিসেস ও মিস কেনেডির গাড়ির উপর বোমা ফেলায় তাঁরা নিহত হলেন। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল গা ঢাকা দিলেন।

প্রফুল্ল মোকামাঘাট রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন। ক্ষুদিরাম ধৃত হলেন। ১১ই অগস্ট ১৯০৮ সালঃ ক্ষুদিরাম ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন।

পুলিশ তৎপর হল। পুলিশ মানিকতলা-বাগানবাড়ি খানাতল্লাস করে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করল এবং শ্রীঅরবিন্দ সহ বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করল। এঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল। এক বৎসর ধরে মামলা চলল। নরেন গোঁসাই বলে এক যুবক প্রাণের ভয়ে রাজসাক্ষী হল। এই মামলারই অপর আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাই দত্ত জেলের মধ্যেই নরেনকে গুলি করে হত্যা করেন। বিচারে দুজনেরই ফাঁসী হল।



শহীদ ক্ষুদিরাম

মামলা চালালেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর যুক্তির বলে ও বিতর্কের জোরে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বারীন ঘোষ ও উল্লাস কর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, পরে হাইকোর্টের আপীলে তা রদ হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, অবিনাশ ভট্টচার্য, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, দেবব্রত বসু, শৈলেন বসু প্রভৃতি পনের জনের দ্বীপান্তর হল। আন্দামানের সেলুলার জেলে সুরু হল তাঁদের নির্বাসন দণ্ড।

কিন্তু বোমা ও গুলি ছোড়া বন্ধ হল না।

যে দারোগা প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দিয়েছিল, কলকাতায় তাকে গুলি করে হত্যা করা হল। সরকারী উকিল আশু বিশ্বাসকে

হত্যা করে ফাঁসি গেলেন চারু বসু। গোয়েন্দা সামসুলকে হত্যা করে ফাঁসি গেলেন বীরেন দত্তগুপ্ত।

এদিকে অনুশীলন সমিতি পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবাত্মক কাজ সুরু করল। সুরু হল একের পর এক স্বদেশী ডাকাতি, ইংরেজ ও রাজকর্মচারী গুপ্ত-হত্যা।

পুলিশ তাদের অনেককে ধরল। তাদের কারো হল নির্বাসন কারো ফাঁসি, কারোর আবার কারাবাস।

শেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালীর কাছে মাথা নত করল ইংরেজ। বঙ্গভঙ্গ রদ হল।

কিন্তু বিপ্লবীদের আন্দোলন থামল না।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠানে বসন্ত বিশ্বাস বড়লাট লর্ড হার্ডিন্‌জের শোভাযাত্রায় বোমা মারলেন। বড়লাট আহত হলেন। নেতা রাসবিহারী বসু চলে গেলেন জাপানে। বসন্ত ধরা পড়ে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন।

১৯১৪ সাল ঃ বিশ্বযুদ্ধ বাধল।

বিপ্লবীরা এই সুযোগে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এদেশে অস্ত্রাদি আনার আয়োজন করলেন। এই কারণে ইউরোপ-আমেরিকায় গেলেন তারকনাথদাস, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রভৃতি।

কিন্তু এত করেও অস্ত্র এদেশে পোঁছলো না, দু-জাহাজ বোঝাই অস্ত্র মাঝপথেই ধরা পড়ে গেল।

বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বালেশ্বরে বুড়ী বালাম নদীর তীরে মাত্র চারজন সাথী নিয়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে প্রাণ দিলেন।

সারা দেশে সুরু হল ব্যাপক ধর-পাকড়।

পুলিশ আবিষ্কার করল দক্ষিণেশ্বরের বোমার কারখানা, বিপ্লবীরা সদলবলে ধরা পড়লেন। জেলে গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারকে খুন করল বিপ্লবীরা। ফাঁসি গেল অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদ চৌধুরী।

যুদ্ধ শেষ হলে এদেশে চালু হল কুখ্যাত রাউলাট আইন। দেশের লোক প্রতিবাদ জানাল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে দশ হাজার নরনারীর এক সভায় গুলি চালালো জেনারেল ডায়ার। এক হাজার নরনারী নিহত হল, আহত হল আরও বেশি। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু গড়ে তুললেন নতুন দল—স্বরাজ্য দল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করলেন।

১৯৩০ সাল।

সারা বাংলায় সুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। গ্রামে গ্রামে খাজনা দেওয়া বন্ধ হল।

লাহোর জেলে কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভগৎ সিং-এর সহকর্মী যতীন্দ্রনাথ দাস ৬৪ দিন অনশনে থেকে মৃত্যু বরণ করলেন।

এদিকে বাংলার বিপ্লবীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠল।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল: একদল সশস্ত্র বিপ্লবী চট্টগ্রাম শহরটি প্রায় দখল করে বসলেন। এদের নেতা ছিলেন মাষ্টার-দা—সূর্য সেন। এদের আদর্শ ছিল সমগ্র ভারতে না হোক, অন্তত চট্টগ্রামে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজে তাঁরা সফল হয়েছিলেন। নিজেরা দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হয়ে শেষে হানলেন চরম আঘাত।

চট্টগ্রামে দুইটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হল—রেলওয়ে ও পুলিশ। রেল—টেলিগ্রাম—টেলিফোন ইত্যাদি সর্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন বিপ্লবীরা। সমগ্র চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের অধিকারে এল। স্বাধীন সাময়িক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। মাস্টারদা হলেন রাষ্ট্রপতি।

চট্টগ্রামে জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে গোরা সেনাদের তুমুল লড়াই হল। দশজন বিপ্লবী মৃত্যু বরণ করলেন, গোরা সৈন্য নিহত হল দেড়শোর বেশি।

কিছুদিন পর সকলেই বিভিন্ন স্থানে থেকে ধরা পড়লেন। সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হল, কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন জেল। অন্যান্যদেরও দীর্ঘ দিনের কারাবাস দণ্ড হল।

বিপ্লবী দল কিন্তু ভেঙ্গে গেল না।

পরপর বিভিন্ন স্থানে এগারো জন ইংরেজ রাজকর্মচারী নিহত হল বিপ্লবীদের গুপ্ত-হত্যায়। মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের হাতে পরপর তিনজন ইংরেজ জেলা-শাসক প্রাণ দিলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। সুভাষচন্দ্র ধৃত হলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। মুক্তি পেয়ে সুভাষচন্দ্র রইলেন গৃহে অন্তরীণ হয়ে। পরে একদিন জানা গেল তিনি অন্তর্ধান হয়েছেন। গেলেন বার্লিনে—বিদেশের সাহায্যে বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সেনাবাহিনী গঠন করে লড়াই করে ভারতকে স্বাধীন করার জন্যে।

৯ই অগস্ট ১৯৪২ঃ গান্ধিজী ঘোষণা করলেন—'ইংরেজ ভারত ছাড়।' ইতিহাসের পাতায় এই আন্দোলনের নাম 'অগস্ট বিপ্লব'! বাঙালী তরুণেরা আত্মবিসর্জন দিয়ে মহান আদর্শ স্থাপন করলো।

তারা মরতে ভয় পায় না, ফাঁসি যেতে ভয় পায় না। রক্তে রঞ্জিত হল বাংলার পথ। কলকাতায় ২০ জন, কাঁথিতে ৩৯ জন, তমলুকে ৪১ জন, বালুরঘাটে ৪ জন এবং শিলিগুড়িতে ৩ জন শহীদ হল। তমলুকে বিদ্যুৎবাহিনী থানা আক্রমণ করল। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার কপাল ফুটো হয়ে পুলিশের নির্মম বুলেট বেরিয়ে গেল। মাতঙ্গিনী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু হাতের নিশান ঠিক আছে তখনও, উড়ছে পতপত করে। কচি কিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও পুরীমাধব প্রামাণিক বীরের মত মৃত্যুবরণ করলেন সেখানে। পঁচিশ হাজার মানুষ থানা ঘিরে রাখল। জ্বালিয়ে দিল দারোগার বাড়ি।

সারা দেশে সুরু হল আবার ব্যাপক ধরপাকড়।

এদিকে এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র বার্লিন থেকে জাপানে চলে আসেন এবং তাঁর বহু দিনের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেন। পঁয়ত্রিশ হাজার সেনা নিয়ে গড়ে তোলা সেনাবাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

২৬শে অক্টোবর ১৯৪৩ঃ সুভাষচন্দ্র বিদেশে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ সরকার'। রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং প্রধান উপদেষ্টা হলেন রাসবিহারী বসু।

সিঙ্গাপুর, শ্যাম, যবদ্বীপ, মালয়, ফিলিপাইন সব জায়গা থেকেই নেতাজী মুক্তি-পাগল ভারতীয়দের পক্ষ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন।

নয়টি বিদেশী রাষ্ট্র নেতাজীর সরকারকে মেনে নিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হল। নতুন নামকরণ হলঃ শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন বসলো।

সংবাদপত্র বের হল, বের হল ডাক টিকিট আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে সংগৃহীত হল কুড়ি কোটি টাকা।

নেতাজী হুঙ্কার দিলেন ঃ দিল্লী চলো—দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।



সুভাষচন্দ্র

ইম্ফল আর কোহিমার দিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলল আজাদ হিন্দবাহিনী। কোহিমা দখল হল—উড়ল সেখানে ভারতের পতাকা।

কিন্তু বিধি বাম। জাপানীদের কাছ থেকে যতটা সাহায্য পাবার কথা ছিল তা পাওয়া গেল না। খাবার, পোষাক ও অস্ত্রের অভাব দেখা দিল। বিমান না থাকায় বৃটিশ বোমারু বিমানকে ঘায়েল করা যাচ্ছিল না। তারপর নামল প্রচণ্ড বর্ষা। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঘিরে ফেলল বৃটিশ সেনারা। ধৃত হল বিশ হাজার আজাদ হিন্দ সেনা।

ইতিমধ্যে জার্মানী ও জাপান আত্মসমর্পণ করল। নেতাজী

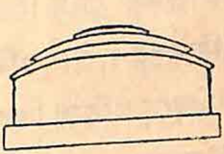
চলে গেলেন টোকিওর দিকে। কিন্তু তিনি আজ কোথায় তা কেউ জানে না।

কলকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত বন্দীদের মুক্তি দাবী করে মিছিল বের হল। পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শেষে জনমতের চাপে বন্দীরা মুক্তি পেল।

ইতিমধ্যে বোম্বাইতে দেখা দিল নৌবিদ্রোহ। সিগন্যাল ম্যান পি. সি. দত্ত জাহাজের গায়ে লিখে দিলেন 'জয় হিন্দ'। এ্যাডমিরাল গডফ্রে কঠোর শাস্তি দিলেন দত্তকে। আগুন জ্বলে উঠল নৌ-সেনার মনে। স্বদেশ প্রেমের আগুন। বিদ্রোহী নৌ-সেনারা কামান দেগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই বিদ্রোহেও বাঙালী নৌ-সেনাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে হাজার হাজার বাঙালী প্রাণ দিয়েছে পুলিশের গুলিতে, ফাঁসিকাষ্ঠে, নির্যাতন ভোগ করেছে কারাবাসে আর নির্বাসনে। তাদের তাজা রক্তেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা।



বাংলার রাজধানী – কলকাতা

বাংলার রাজধানী কলকাতা। আজকের কলকাতা ভারতের বৃহত্তম নগর। নগর বললে ভুল হবে—মহানগর। পৃথিবীর বৃহত্তম নগরগুলির মধ্যে কলকাতা অন্যতম। বন্দর হিসাবেও কলকাতার গুরুত্ব অনেকখানি। দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বন্দর এই কলকাতা।

কলকাতার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কবি বিপ্রদাস পিপলাই পঞ্চদশ শতকে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই কাব্যে কলকাতা নামে একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়। আবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। তাতেও কলকাতা গ্রামের উল্লেখ আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে অতি প্রাচীনকালেও কলকাতা নামে একটি গ্রাম ছিল আমাদের এই বাংলা দেশে।

আজকের কলকাতা শহর যেখানে অবস্থিত—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সেখানে ছিল তিনটি গ্রাম। উত্তরে সূতানুটি, মধ্যে কলকাতা আর দক্ষিণে গোবিন্দপুর। গ্রামগুলির অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। তিনটি গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে ছিল এঁদো পুকুর, খাল, বিল, ডোবা আর জঙ্গল। তারই মধ্যে কোথাও ছিল ধানের খেত, কোথাও ফলমূলের বাগান ; আর কোথাও বা বাঁশঝাড় ও হোগলার ঝোপ। বলতে গেলে খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছিল গোটা অঞ্চলটায়। উত্তরে চিৎপুর থেকে দক্ষিণে কালীক্ষেত্র (বর্তমান কালীঘাট) পর্যন্ত একটি

মাত্র পথ ছিল। তীর্থযাত্রীরা সেই পথ ধরে তীর্থ করতে যেতেন কালীক্ষেত্রে। সে পথও মোটেই ভাল ছিল না। পথের দুধারে ছিল ঝোপ-ঝাড়। আর সেখানে লুকিয়ে থাকতো ঠ্যাঙারেরা। সুযোগ পেলেই পাবড়া* ছুড়ে মারতো তীর্থযাত্রীদের। তাদের সর্বস্ব অপহরণ করতো।

এই তিনটি গ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরই বসবাস ছিল বেশী। ধোপা,নাপিত,চুনারী, তাঁতী, কলু ও জেলেরাই সংখ্যায় বেশী ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ থাকলেও—সংখ্যায় তারা খুবই কম ছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নাম থেকে কলকাতায় অনেক পাড়ার নামকরণ হয়েছে। যেমন—কলুটোলা, জেলেটোলা, মুচিপাড়া, চুনারিপাড়া, যুগীপাড়া ইত্যাদি। কলকাতা মহানগরে আজও এসব পাড়া বর্তমান। বর্তমান বাগবাজার, কুমারটুলি ও বড়বাজার অঞ্চলে সূতানুটি গ্রাম। নুটি মানে গোলা—সূতানুটি মানে সূতার গোলা। আগে এখানে ছিল সূতার গোলার হাট। তারই থেকে এ গ্রামের নাম হয়েছে সূতানুটি। সূতানুটি গ্রামের পাশে নদীর উপরেই ছিল কলকাতা গ্রাম। মোটামুটিভাবে বড়বাজার থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত এ গ্রাম বিস্তৃত ছিল। কলকাতা গ্রামের পাশেই ছিল গোবিন্দপুর। এখানে চারটি বসাক ও একটি শেঠ পরিবার বাস করতো। বসাকদের কুলদেবতা ছিলেন গোবিন্দজী। তাঁরই নামানুসারে এ গ্রামের নাম রাখা হয় গোবিন্দপুর। এই গ্রামেই এখন 'ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ' রয়েছে। এসপ্লানেড থেকে দক্ষিণে হেস্টিংস পর্যন্ত নদীর ধার বরাবর অঞ্চলটিতে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। প্রাচীন এই তিনটি গ্রামের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে আজকের কলকাতার শহর।

---

* ১ হাত লম্বা লাঠি।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। ঔরঙ্গজেব তখন মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ইংরেজরা তখন হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেছে। হুগলীর ইংরেজ কুঠির কুঠিয়াল-তখন জব চার্নক সাহেব। সাহেব গিয়েছিলেন বালেশ্বরে। সেখান থেকে ফিরলেন হুগলীতে। সেটা ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ফিরবার পথে জব চার্নক সাহেব নেমে পড়লেন সূতানুটি গ্রামে। সেদিন রবিবার, ২৪শে অগস্ট ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ। সেইদিনই কলকাতার মাটিতে ইংরেজের প্রথম পদক্ষেপ ঘটলো।

জব চার্নক সাহেব ছিলেন বিচক্ষণ কুঠিয়াল। সূতানুটি পরিবেশ তার ভাল লাগলো। তিনি ইংরেজ কুঠি স্থাপন করলেন সূতানুটি গ্রামে—কয়েকখানি গোল পাতার ঘরে। সূতানুটিতেই সেই সময় হাট বসতো। হাটে প্রধানত সূতা ও কাপড় বেচা হতো। বৌবাজারের কাছে শিয়ালদা অঞ্চলে তখন একটি বিরাট বটগাছ ছিল। তারই তলায় বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া টানতে টানতে জব চার্নক সাহেব ব্যবসার সালিশী করতেন।

কিছুকাল পরেই ইংরেজদের মাদ্রাজ কুঠির বড় সাহেব গোল্ডস্‌বরা এলেন কলকাতার নতুন কুটি দেখতে। তাঁর পরামর্শে মাটি ফেলে গোলদীঘির পাড় উঁচু করা হলো। আর কুঠির কাজ চালাবার অপিসের জন্যে জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের দালান কাছারি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। সাবর্ণ চৌধুরীরা ছিলেন এ অঞ্চলের প্রধান জায়গীরদার। তাদের বড় বড় দর দালান, কাছারিবাড়ি, পূজা মণ্ডপ, দেওয়ান বাড়ি প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ আজও কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িশাতে দেখা যায়।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলার সুবাদার তখন আজিম উসমান। আজিম উসমানের কাছ থেকে জব চার্নক সূতানুটি, কলকাতা ও

গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানির জমিদারী স্বত্ব কিনলেন। সেজন্যে সুবাদারকে দিতে হলো ষোল শত টাকা সেলামী। আর বড়িশা-বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের দিতে হলো তেরশত টাকা। জমিদারী কেনা হলো ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর। এই জমিদারী স্বত্ব কেনার বায়নানামা আজও বৃটিশ মিউজিয়ামে যত্ন সহকারে রাখা আছে।

ইংরেজরা এদেশে শুধু বণিক হয়েই আসেনি, তাঁরা বহু বছর ধরে কলকাতা এবং তার আশেপাশের অনেক গ্রামের জমিদার হয়েও ছিলেন। ১৬৯৮ থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওরা নির্বিঘ্নে চালিয়ে গেলেন ব্যবসা ও জমিদারী। ওঁদের হাতেই পত্তন হলো কলকাতা শহরের। সূতানুটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম নিয়ে।

'কলকাতা' নামটি নিয়ে মতভেদ আছে। তবে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'কলকাতা' নামের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই সর্বজন গ্রাহ্য হয়েছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলি বা কলিচুনের কাতা বা অঞ্চল থেকেই কলকাতা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আগে নাকি এখানে শামুকের আড়ত ও কলিচুনের কারখানা ছিল। তাই থেকেই কলকাতা নামটি এসেছে।

কলকাতার পত্তন করেই ইংরেজরা কলকাতাকে প্রেসিডেন্সিতে পরিণত করল। স্থির হলো কলকাতায় থাকবে একজন ইংরেজ প্রেসিডেণ্ট। আর প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে থাকবে তাঁর কাউন্সিল। সামন্ততান্ত্রিক বাংলার মাটিতে কলকাতার বুকে সেই প্রথম পত্তন হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ইংলণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় উইলিয়ম। জমিদারী রক্ষার জন্যে কলকাতায় দুর্গ তৈরির অনুমতি

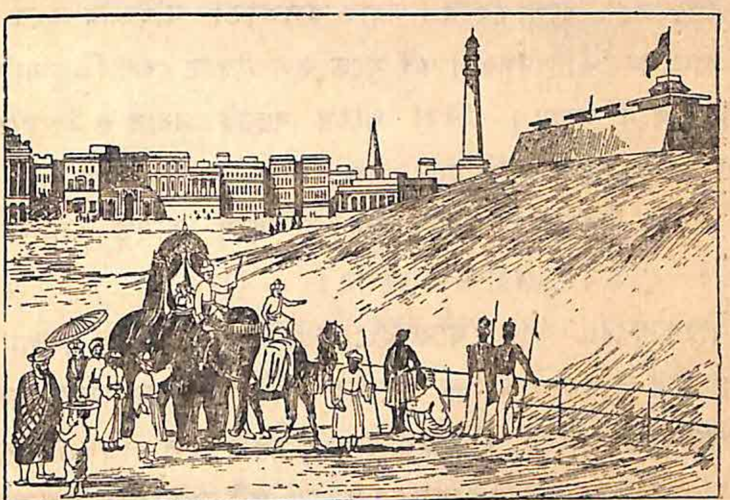
পেলেন ইংরেজরা। তার ফলে কলকাতা লালদীঘির পশ্চিমে যে দুর্গ গড়ে উঠলো তার নাম রাখা হলো ফোর্ট উইলিয়াম। পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে দুর্গের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলো। গঙ্গার নতুন খাল ও জেটি তৈরী হলো।

লালদীঘির নাম তখনও লালদীঘি হয়নি। তার পঙ্কোদ্ধার করে ঐ দীঘি ও তার আশেপাশের অংশটার নাম দেওয়া হল 'ট্যাঙ্ক স্কোয়ার'। সেটা হলো হাওয়া খাওয়ার জায়গা। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে চিৎপুর, সিমলা, মির্জাপুর, আরপুলি, কলিঙ্গা ও চৌরঙ্গী গ্রাম কিনলেন। তখন কলকাতার জনসংখ্যা পাঁচ-ছয় হাজার। আর তার মধ্যে বারশো হলো ইংরেজ।

জমিদারী বাড়লো বলে কাউন্সিল থেকে একজন মেয়রকে কলকাতার 'জমিদারী' দেখাশোনার ভার দেওয়া হলো। তাঁর নাম দেওয়া হলো জমিদার। প্রথম জমিদার নিযুক্ত হলেন র‍্যাল্‌ফ শ্লেলডেন। কলকাতায় দেশীয় লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। তাই একজন দেশীয় জমিদার নিযুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। প্রথম দেশীয় জমিদার নিযুক্ত হলেন নন্দরাম সেন। তাঁকে বলা হতো কালা জমিদার। শহরে জঙ্গল কাটানো, ডোবা বোজানো, বাজার বসানো, ড্রেন ও সেতু তৈরী করা ইত্যাদি কাজ ছিল জমিদারের। ১৭০০ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতার বেশ উন্নতি হলো। চীনাবাজার থেকে হেস্টিংস স্ট্রীট পর্যন্ত সাহেবপাড়া বিস্তৃত হলো। বড়বাজার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। ব্যবসার জন্যে দেশ-বিদেশের লোক আসতে লাগলো কলকাতায়। বেশ কিছু পাকা বাড়িও তৈরী হলো এখানে।

এরপর কলকাতার উন্নতি হতে লাগলো দ্রুত। ১৭১৬

খ্রীস্টাব্দে এই শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বারো হাজারে। ইংরেজদের গীর্জা 'সেণ্ট অ্যানস্ গীর্জা' প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো পর্তুগীজ ও আর্মানীদের গীর্জা। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে একসঙ্গে চারটি আদালত বসানো হলো কলকাতায়। মেয়র্স কোর্ট, আপিল কোর্ট, ছোট আদালত ও দেশীয়দের বিচারের জন্যে আদালত।



শতবর্ষ পূর্বের কলকাতা [প্রাচীন চিত্র হইতে

বর্গীর হাঙ্গামা দেখা দিলে উত্তরে বাগবাজার থেকে দক্ষিণে কুলিবাজার (হেস্টিংস) পর্যন্ত সাত মাইল জুড়ে একটা খাল কাটানো হলো। খাল কাটানোর জন্যে খরচ হলো পঁচিশ হাজার টাকা। খালের নাম রাখা হলো 'মারহাট্টা ডিচ'। কাটা খালের মাটি দিয়ে কলকাতার কিছু নিচু অংশ ভরাট করা হলো। আর তৈরী হলো কয়েকটি ভাল রাস্তা (যেমন লেনিন সরণি, নেতাজী সুভাষ রোড ইত্যাদি)। ধীরে ধীরে কলকাতার বাজারের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে পাকা বাড়িরও। কলকাতায় তখন নটি বাজারঃ

বাগবাজার, শোভাবাজার, বৌবাজার, বড়বাজার, লালবাজার, নতুন বাজার, চার্লস বাজার, হাঠখোলা বাজার ও শ্যামবাজার। বাড়ির সংখ্যা তখন ১৪,৭১৮। আর মোট জমির পরিমাণ ৯,২৫৫ বিঘা।

১৭৫৬ সাল।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলো। যুদ্ধে ইংরেজরা গেলো হেরে। নবাব কলকাতা অধিকার করে তার নাম রাখলেন 'আলিনগর'। এই যুদ্ধে কলকাতার বেশ কিছু বাড়িঘর ও গীর্জা ধ্বংস হলো। কিন্তু পরের বছরই নবাব ও ইংরেজদের বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল পলাশীর আমবাগানে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ইতিহাস প্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলেন।

মীরজাফরের কাছ থেকে ইংরেজরা চব্বিশ-পরগনা জেলা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের জমিদারী স্বত্বলাভ করলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরেই 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'।

মুর্শিদাবাদের রাজ-কোষাগার থেকে লুণ্ঠিত টাকায় কলকাতার ইংরেজ সাহেবরা অনেক পাকা বাড়ি গড়ে তুললেন। যে সব দেশীয় লোক ইংরেজদের কাজে 'সহায়তা' করলেন তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলো। কলকাতার জীবনেএলো সম্পদের জোয়ার। দালালী ও ফড়েগিরি করে অনেক দেশীয় লোক প্রচুর টাকা রোজগার করলেন। সমাজে বর্ণের চাপ কমতে লাগলো। বাড়তে লাগলো অর্থের চাপ।

১৭৭৪ সাল।

সরকারীভাবে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হলো। কিন্তু কলকাতার অবস্থা তখনও ভাল ছিল না। আবর্জনা পরিষ্কারের কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল বটে। ছোট একটি পুলিশ বাহিনীও ছিল।

কিন্তু রাস্তায় আলো ছিল না। বড়লোকের পাল্‌কি রাতে চললে—তার আগে আগে যেতো মশালধারীরা। রাস্তায় চাকার গাড়ি চলতো না। কারণ রাস্তা ছিল নরম মাটির। তাতে গাড়ির চাকা বসে যেতো।



দালাল



কেরানী

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ১৮০৫ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লটারী করে টাকা তুলে তাই দিয়ে 'টাউন হল' নির্মিত হয়। লটারীর টাকায় অনেক বড় বড় রাস্তা তৈরি হয়। ১৮৪৭ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের গোড়া পত্তন হয়। পরিষ্কৃত ও পরিশোধিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয় কলকাতা শহরে। মাটির নীচে নর্দমা তৈরি হয়। বড় বড় রাজপথের পাশে তৈরি হয় ফুটপাত। নিউমার্কেটও স্থাপিত হয় এই বছর। ১৮৯২ সালে খিদিরপুর ডক প্রতিষ্ঠার পর কলকাতার সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বৃহত্তর কলকাতার শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত হয় ব্যারাকপুর থেকে বজবজ পর্যন্ত। পাটকল, ইনসিওরেন্স, ব্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা।

১৯১১ সালে কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান কলকাতার পুরনো ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট বিন্যাস করে শহরের আমূল সংস্কার করেন। বহু নতুন অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন বসতি ও পথঘাট নির্মাণ করেন। এমনিভাবে কলকাতা শহর ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে হতে আজ এক সুন্দর মহানগরে পরিণত হয়েছে। শহরের লোকসংখ্যা যত বেড়েছে, সীমানাও তত বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি গ্রাম অথবা শহরতলি আত্মসাৎ করে কলকাতা শহর তিনদিকে ডালপালা বিস্তার করেছে। আজ কলকাতা শুধু সর্বভারতীয় শহর নয়—সার্বজাতিক শহর। ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলকাতা শহরই ছিল ভারতের রাজধানী ; পরে তা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

আমরা বাঙ্গালী। মাতৃভাষা আমাদের বাংলা। এই ভাষাতেই আমরা কথা বলি। এই ভাষাতেই আমরা লিখি। বাংলা ভাষা আমাদের আশার বস্তু—গর্বের বস্তু। মাতৃভাষায় কথা বলে আমাদের কতো শান্তি, কতো তৃপ্তি! জন্মেই আমরা মাতৃভাষায় 'মা' বলে ডেকেছি। মৃত্যুকালেও মাতৃভাষায় ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে যাব। কবি অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা ভাষার স্তুতিগান গেয়েছেন এইভাবে ঃ

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা,
আনল দেশে ভক্তি-ধারা;
আছে কই, এমন ভাষা
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা।
... ...
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাকনু মায়ে 'মা, মা' বলে,
ঐ ভাষাতেই বলব, হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥

জন্মের পর থেকেই মাতৃভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় শুরু হয়। আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ ভাষাতেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। যার সঙ্গে আমাদের এত নিবিড় সম্পর্ক তার কথা জানা সব আগে দরকার।

ভারতে প্রথমে আসে বৈদিক যুগের ভাষা। তার মানে ঋগ্বেদের যুগের ভাষা। পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আমরা এই ভাষারই মার্জিত রূপ দেখতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর আগের বৈদিক সূক্তে। আর এ ভাষার কথ্য রূপের আভাষ পাই ঋগ্বেদে এবং তার পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

ঋগ্বেদে দেবতাদের আরাধনা বিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটি সংগ্রহ। এতে ১০২৮টি সূক্ত বা স্তোত্র আছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা বা কবিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই সব স্তোত্র রচনা করেছিলেন। প্রথমে এই স্তোত্রগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরে এগুলিকে সংগ্রহ করে একখানি গ্রন্থে সঙ্কলিত করা হয়। সঙ্কলনকাল ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ঋগ্বেদের ভাষা ভারতের আর্য-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এর আগেকার কোন বই বা লেখা আমরা পাইনি। কাজেই ঋগ্বেদের আগে আর্য-ভাষার রূপ যে কেমন ছিল তা আমরা জানি না। আমাদের বাংলা ভাষা আর্যগোষ্ঠীর ভাষাগুলির একটি বড় শাখা।

ঋগ্বেদের পর থেকে অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ধারাবাহিক-রূপে আর্য ভাষার নদী বয়ে এসেছে একেবারে আধুনিক বাংলা পর্যন্ত। ঋগ্বেদের সময় থেকে একাল পর্যন্ত আর্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে। এই সাহিত্যের নিদর্শন আছে বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি ও গাথা সাহিত্যে। আর আছে সম্রাট অশোক ও তাঁর পরবর্তী সময়ের শিলালেখে,

জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য ভাষাগুলির সাহিত্যে এবং আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। বৈদিক কাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের কাল পর্যন্ত এমনিভাবে একটি দীর্ঘ ভাষার শিকল চলে এসেছে।

বৈদিক সাহিত্য তিন স্তরে বিভক্ত—বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে বেদ বলতে বোঝায় 'পবিত্র জ্ঞান'। বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋক্, সাম ও যজুঃ হচ্ছে যজ্ঞীয় বেদ আর অথর্ববেদ অযজ্ঞীয় বেদ। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বেদ লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। হিন্দুরা বংশ পরম্পরায় শুনে বেদের শ্লোকগুলি মুখস্থ রাখতেন। শুনে শুনে মনে রাখতেন বলে বেদের অপর এক নাম 'শ্রুতি'।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে বিভিন্ন যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। আর আছে কিছু প্রাচীন উপাখ্যান। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট হচ্ছে উপনিষদ। এতে সে যুগের কবি-মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তার সরল কবিত্বময় প্রকাশ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা।

ঋগ্বেদের ভাষা ক্রমে ক্রমে সরল হয়ে অন্যান্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। উপনিষদের ভাষার পর সৃষ্টি হলো সংস্কৃত ভাষা। কাজেই উপনিষদের ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার জননী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে ক্রমশ অনেক বৈদিক শব্দ লোপ পায় এবং প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা জন্ম নেয়। এই নতুন ভাষায় বহু নতুন শব্দ ও অনার্য জাতির ভাষার শব্দ যুক্ত হয়। ফলে সংস্কৃত এক সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। শব্দ সম্পদে

সংস্কৃতের ঐশ্বর্য অতুলনীয়। এরপর পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গান্ধারে বসে বিখ্যাত 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ' রচনা করেন। পাণিনির হাতে সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃত ভাষা পরিশুদ্ধ হয়। এরপর থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বাহক হয় সংস্কৃত ভাষা।

সংস্কৃত ভাষা কিন্তু জনসাধারণের ভাষা হয়ে ওঠেনি। কারণ আর কিছু নয়—কঠিন বলে। ধীরে ধীরে সংস্কৃত ভাষার কঠোরতা হ্রাস পেলো এবং সৃষ্টি হলো প্রাকৃত ভাষার। প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝায় জনসাধারণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। পালি ভাষা এমনি এক প্রাকৃত ভাষা। বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষকে ধর্মোপদেশ দিতেন এই পালি ভাষাতেই। আর বৌদ্ধ হীনযান সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রগুলিও এই পালি ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকও তাঁর ধর্মলিপি-গুলি প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। জনসাধারণের জন্যই তাঁর ধর্মলিপি। তাই সেগুলি জনসাধারণের ভাষাতেই লেখা হয়েছিল।

প্রাকৃত ভাষার মধ্যেও আবার স্থানীয় পার্থক্য ছিল। উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভেদে ভারতের চার অঞ্চলে কয়েক রকমের প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল। তাদের নাম ছিল—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধ-মাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। এইসব প্রাকৃত ভাষার ধ্বনির পরি-বর্তন ঘটতে ঘটতে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি হয়। অপভ্রংশও সাহিত্যের ভাষা, তবে তা যথাসম্ভব সংস্কৃতের প্রভাব বর্জিত। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতিও খানকয়েক বই অপভ্রংশে লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'কীর্তিলতা' বইটি বিশেষ খ্যাত।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই অপভ্রংশ ভাষাগুলি থেকেই নবীন ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির উদ্ভব হয়। এই ভাষাগুলি

হচ্ছে—বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাতী ও মারাঠী। এগুলি সৃষ্টি হয়েছে মাগধী অপভ্রংশ হতে।

মাগধী অপভ্রংশ থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রাচীন বাংলার রূপ কেমন ছিল তা নীচের অংশটুকু পড়লেই বোঝা যাবে ঃ

'গাণ গাহিআ নার বাহিআ কে আইশই পারহি।'

কালে প্রাচীন বাংলা মধ্যযুগের বাংলায় পরিণত হয়—আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। মধ্যযুগের বাংলার একটু নমুনা নীচে দেওয়া হলো ঃ

'গান গ্যায়া নাও ব্যায়া কে আস্তে পারে।'

আর আধুনিক বাংলার সূচনা হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। আধুনিক বাংলার রূপ ঃ

'গান গেয়ে না' বেয়ে কে আসে পারে।'

সংস্কৃত থেকে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলার মধ্য দিয়ে কিভাবে আধুনিক বাংলা গড়ে উঠেছে তার দুটি দৃষ্টান্ত নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

সংস্কৃত	পালি	প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাংলা	আধুনিক বাংলা
অস্মে	অম্হে	অম্হে	অম্হি	অহ্মে	আমি
কৃষ্ণ	কণ্হ	কণ্হ	কণ্হ	কাহ্ন	কানু, কানাই

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষার মত বাংলা ভাষারও নানা রূপ আছে। বাংলার সাহিত্যিকরূপকে বলা হয় 'সাধুভাষা'। সাধারণত এই সাধু ভাষায় গদ্য-সাহিত্য ও চিঠিপত্র লেখা হয়। এই সাধু ভাষার চেহারা বঙ্গদেশের সর্বত্রই এক রকম। এই ভাষা কিছুটা সংস্কৃত ঘেঁসা। সাধু ভাষার নিদর্শন ঃ

> 'তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেতে ছিল। সে যখন আসিয়া বাটীর নিকটবর্তী হইল, তখনই নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল।'

সাধু ভাষার পাশাপাশি আছে বাংলার নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক ভাষা। এগুলির মধ্যে কলকাতা অঞ্চলের এবং ভাগীরথী-নদীর দুই তীরের ভদ্র সমাজের ব্যবহৃত ভাষাই চলিত বাংলা ভাষা। চলিত বাংলা ভাষার রূপ নীচে দেওয়া হলো ঃ

> 'তখন তার বড়ো ছেলে খেতে ছিল। সে এসে বাড়ির কাছে যেমনি পৌঁছুলো, ওমনি নাচগান বাজনার শব্দ শুনতে পেলো।'

সাধু-ভাষার মত চলিত ভাষাও আজকাল সাহিত্যে খুব ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভাষার এই দুই রূপ (সাধু ও চলিত) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 'রূপকথায় বলে, এক যে ছিল রাজা, তার দুই রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী ; তেমনি বাংলা বাক্যাধিপেরও আছে দুই রানী ; একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা, আর একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোন কোন লেখায় আমি বলেছি, প্রাকৃত বাংলা। সাধুভাষা মাজাঘসা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।......

'রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়াল ঘরে, কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিকে থাকে একলা দুয়োরানী—রানীর পদে। বাংলা চলতি ভাষা বহুকাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে,

গোয়ালের ধারে, গোবর নিকানো আঙিনার পাশে, যেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসী তলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো-সম্পূর্ণ আসেনি; কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।'

ভাবের প্রকাশ হয় ভাষায়। আর ভাষার প্রকাশ হয় বর্ণমালা বা লিপিতে। কাজেই ভাষা প্রসঙ্গে লিপির কথাও আপনা-আপনিই এসে পড়ে। তাই লিপির কথাও এখানে আলোচনা করা দরকার। ভারতে প্রাচীনতম লিপি হচ্ছে 'হরপ্পা লিপি'। এ লিপি সম্ভবত কোন অনার্য ভাষার লিপি। যাই হোক—এ লিপির পাঠোদ্ধার কিন্তু এখনও সম্ভব হয় নি।

হরপ্পা পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলায়। বর্তমানে এ স্থানটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার ভূগর্ভ খুঁড়ে পাঁচ

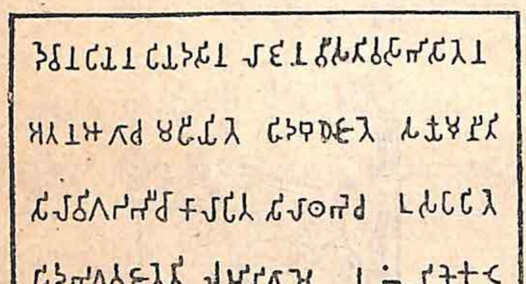


হরপ্পার সীলমোহর

হাজার বছর আগেকার সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে এখানে একটি বিরাট নগর ছিল। হরপ্পা লিপির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলি সাধারণত ছোট ছোট সীল এবং ফলকের উপর উৎকীর্ণ।

আজকাল দেবনাগরী বর্ণমালায় সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলে অনেকের ধারণা যে দেবনাগরীই ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা এবং এই দেবনাগরী থেকেই বাংলা বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণাটা কিন্তু ভুল। বলা যেতে পারে যে দেবনাগরী ও বাংলা বর্ণমালা পরস্পর ভগিনী সম্পর্কে সম্পর্কিত। দেবনাগরী হচ্ছে গুজরাট, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে গোটা উত্তর ভারতে ও অন্যত্র এর প্রসার ঘটেছে।

ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অনুশাসনে। এই অনুশাসনগুলি প্রধানত ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।



ব্রাহ্মী লিপিতে অশোক-অনুশাসন

ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত বলেন ব্রাহ্মী লিপি ফিনীশিয়া দেশের বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। আবার আর একদল পণ্ডিত বলেন—না,

তা নয়, ভারতেই এই লিপির উদ্ভব হয়। মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পার আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীলমোহরে যে লিপি বর্তমান তা প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন। খুব সম্ভব তা কোন অনার্য ভাষার লিপি। ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছে তার থেকেই। ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল। বর্ণগুলি মাত্রারেখাহীন।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মী লিপির তুটি পৃথক রূপ গড়ে উঠেছিল। এর দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ থেকে তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালাম প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। আর উত্তর ভারতীয় রূপ থেকে বাংলা, দেবনাগরী ও এদের সমগোত্রীয় লিপিগুলির উদ্ভব হয়েছিল। উত্তর ভারতে কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে ব্রাহ্মী লিপি পরিবর্তিত হয়েছিল। কালক্রমে সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর সেই পরিবর্তিত ব্রাহ্মী লিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। সেই তিনটি রূপের মধ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রচলিত রূপের নাম 'শারদা'। দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর'।

পরিবর্তিত ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপভেদ থেকেই বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি হয়েছে। নাগর থেকে এসেছে দেবনাগরী। আর শারদা থেকে এসেছে গুরুমুখী বর্ণমালা।

বাংলা ভাষা তার জন্মকাল থেকেই বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়ে আসছে। তবে এই বাংলা অক্ষরের আদিম রূপ তার বর্তমান রূপ থেকে কিছুটা পৃথক ছিল।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে কবিতার মধ্য দিয়ে। অতি প্রাচীন কালের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই চর্যাপদ নামে কতকগুলি গীতিরচনার মধ্যে। চর্যা শব্দের অর্থ সাধনীয় পদ বা গান। চর্যাপদগুলির রচয়িতা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক কবিরা। এগুলির মধ্যে বৌদ্ধদের সাধন-প্রণালীর গোপন সঙ্কেত আছে। এগুলির রচনাকাল নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বলে অনুমিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে একখানি অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। ঐ পুঁথিটির মধ্যে ছিল তিনখানি বই—চর্যাচর্য বিনিশ্চয়, দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব। এর মধ্যে চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের ভাষা খাঁটি বাংলা। অন্যগুলিতে হিন্দীর প্রভাব বেশী। চর্যাপদের কবিতাগুলির অর্থ কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বোঝা যায় না—এমনই ভাষায় লেখা। যেমন ঃ

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।

অর্থাৎ উঁচু-উঁচু পর্বত। সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরী বালিকার পরিধানে ময়ূরপুচ্ছ আর গলায় গুঞ্জার মালা। আবার—

ভব নই গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দু অন্তে চিলিন নাঝে ন থাহী।

অর্থাৎ ভবনদী গম্ভীর বেগে বয়ে যাচ্ছে। তার দুদিকে পিচ্ছিল পাঁক আর মাঝখানে অথৈ জল।

চর্যাপদের মধ্যে একদিকে যেমন সেকালের মানুষের জীবনের চিত্র আঁকা হয়েছে, তেমনি আছে অনেক তত্ত্বকথা।

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা বঙ্গদেশ অধিকার করে। এরপর থেকে প্রায় তিনশো বছর বাংলা ভাষায় রচিত উল্লেখযোগ্য কোন রচনার সন্ধান মেলে না। এই সময়ের মধ্যে লোকের মুখে মুখে গান, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালের কবিরা লৌকিক কাহিনীগুলিকে কাব্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে চর্যাপদ। আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। আমাদের আধুনিক বাংলা তৃতীয় স্তরের। চর্যাপদের ভাষার চেয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সহজ। আধুনিক বাংলা তার চেয়েও সহজ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা হলেন অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে গোকুলে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলো রান্ধন।

অর্থাৎ আমার শরীর আকুল। আমার মনও আকুল। বাঁশীর শব্দে আমার রান্নার কাজে গোলমাল হয়ে গেল।

বাংলা সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ কাব্য হিসাবে এই পদাবলীর মূল্য ও মর্যাদা অতুলনীয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেব-দেবীর মহিমা, পূজা পদ্ধতি এবং বহু লৌকিক কাহিনী ছড়ার আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সব কাহিনী কাব্যরূপ ধারণ করে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত হয়। যে কাব্যে দেব-দেবীর আরাধনার কথা এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, যে কাব্য শুনলে এবং ঘরে রাখলে মঙ্গল হয়—তাই মঙ্গলকাব্য।

মঙ্গলকাব্যের দেবতা ছিলেন চণ্ডী, ধর্ম, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি। এঁরা সবাই অনার্য দেবতা। এঁদের মধ্যে নারী দেবতার সংখ্যাই বেশী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর, মনসামঙ্গলকাব্যে মনসার এবং ধর্ম-মঙ্গলকাব্যে ধর্মঠাকুরের পূজা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য-গুলির মধ্যে কয়েকটি বলিষ্ঠ ও আদর্শ চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। যেমন চাঁদ সদাগরের চরিত্র বা বেহুলার চরিত্র। মঙ্গলকাব্যগুলি দেব-দেবীর মহিমা প্রচারের জন্যে মুখ্যত লেখা হয়ে থাকলেও এদেরও ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য আছে অনেকখানি।

রামায়ণ এবং মহাভারত ভারতের জাতীয় মহাকাব্য। মূল মহাকাব্য দুখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি। আর মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মুসল-মানদের যুগে ভারতের এই দুই অমর মহাকাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। কবি কৃত্তিবাসও বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। আর মহাভারত রচনা করেন কবি কাশীরাম দাস। এই দুখানি মহাকাব্যই বাংলা ভাষার গোড়ার দিকে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সাহিত্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত জনপ্রিয় কাব্য বাংলা ভাষায় আর নেই বললেই চলে। সেকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অংশবিশেষ লোকের মুখে মুখে গীত হতো। কিন্তু কালক্রমে অন্য কবিদের রচনাও কৃত্তিবাসের নামে চলতে লাগলো। আজ কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলে যে রামায়ণ চলছে তার মধ্যে কবিচন্দ্র, অদ্ভূতাচার্য প্রভৃতি বহু কবির রচনা আত্মগোপন করে আছে। বর্তমান রামায়ণের কোন্ অংশটুকু কৃত্তিবাস রচিত এবং কোন্ কোন্ অংশ অন্য কবিদের রচিত—তা বোঝবার উপায় নেই। কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবি বাংলায়

রামায়ণ রচনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনন্ত কন্দলী রচিত রামায়ণখানি উল্লেখযোগ্য।

কবি কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত বা কাশীদাসী মহাভারত বাঙ্গালীদের কাছে 'অমৃত সমান'। কবি কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসের কবিত্বও বাঙালীর হৃদয় জয় করেছে। বাঙালীর জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাব অসামান্য।

বাঙালীর চিন্তারাজ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেব লেখনী ধারণ করেন নি বটে, কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে উপলক্ষ করে এককালে বাঙালীর ভাব, ধ্যান ও ধারণা আত্মপ্রকাশ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। তাঁর মহৎ জীবনের প্রেরণায় একদা সমগ্র বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জাগরণ সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও চরিত্র নিয়ে যোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি কাব্য রচিত হয়েছিল। বৃন্দাবনদাস বিরচিত 'চৈতন্য-ভাগবত' বাংলার প্রথম জীবনী-সাহিত্য। এই মহান জীবনী কাব্যে সেকালের বাঙ্গালী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। আর ফুটে উঠেছে সহজ ও মধুর পয়ার ছন্দে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনলীলা লোচনদাস রচিত চৈতন্য-মঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বিষয়ক দুখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় বহু জীবনী কাব্য রচিত হয়েছিল। এইসব জীবনী সাহিত্যের মধ্যে আমরা বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বহু উপাদান খুঁজে পাই।

চর্যাপদের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। চর্যাপদগুলি

একরকম গান। এগুলির মত আর একরকম গান বা পদ বাংলা ভাষায় রচিত হয়। সেগুলি বাংলা সাহিত্যে পদাবলী নামে পরিচিত। বাংলার এই পদাবলী সাহিত্য দুই শ্রেণীর—বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর উপজীব্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের লীলা বা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী। আর শক্তি দেবী শ্যামা মাকে উপজীব্য বিষয় করে যে পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল—তা হচ্ছে শাক্ত পদাবলী। এই পদাবলী সাহিত্য বাংলা ও বাঙ্গালীর অমূল্য সম্পদ।

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাদের মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। নরোত্তম দাস পদাবলী কীর্তনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে গেছেন।

শক্তির উপাসকদের বলা হয় শক্তি। শাক্ত হলেন শিবের গৃহিণী চণ্ডী। দুর্গা, কালী, গৌরী প্রভৃতি বিভিন্ন নাম তাঁর। শাক্ত কবিরা যে সব গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন তাই শাক্ত পদাবলী নামে খ্যাত। শাক্ত পদকর্তারা চণ্ডীর ভয়ঙ্করী মূর্তির পরিবর্তে চণ্ডীকে মাতা বা কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। শাক্ত পদাবলীতে আগমনীর আনন্দ এবং বিজয়ার দুঃখ—দুইই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এই শাক্ত সাধনতন্ত্রেরই একটি ধারা হচ্ছে শ্যামা-সঙ্গীত। সাধককবি রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির নাম শ্যামা-সঙ্গীত রচনার জন্য উল্লেখযোগ্য।

জাতির ভাবের ভাষা পদ্য আর জ্ঞানের ভাষা গদ্য। পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই পদ্যের অনেক পরে গদ্যের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জন্মের পর থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় বাংলা সাহিত্যের কাব্যের যুগ। এই যুগে গদ্য রচনার বিশেষ কোন নিদর্শন চোখে পড়ে না।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পত্তন হয় ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে। পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকরাই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শক। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাদ্রীরা বাংলা গদ্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বাংলায় আমরা যে প্রথম গদ্য গ্রন্থখানি পাই—তা হচ্ছে 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ'। লেখক দোম আন্তনিও। নামে পর্তুগীজ কিন্তু মানুষ হিসাবে বাঙ্গালী। ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ গ্রন্থের ভাষার নমুনা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

'ব্রাহ্মণ। যদি পরমার্থে জিগাসো, তবে যে বিচার তুমি কহো, এ হাতো তো চিতে কদাচিতো লএনা যে পরমেশ্বর এমত করেন; কিন্তু শাস্ত্রে কহে যে একথা যেতো কালের পাপে করমাক্কিতে লওয়াএ।'

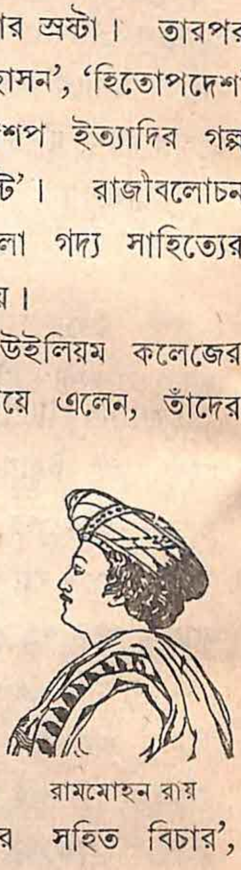
যে সব পাদ্রী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে জর্জ টমাস, উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড ও আরও অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের ব্যাপক চর্চা ও প্রচার চলতে থাকে। উইলিয়ম কেরী সাহেব সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশ করেন।

সেকালে বিলাত থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী এদেশে আসতেন। এদেশের ভাষা তাঁদের জানা দরকার। তাই হ্যালহেড সাহেব একখানি বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজীতে প্রকাশ করলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয়রাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাংলা গদ্যের ব্যাপক অনুশীলনের সূচনা করেন। তবুও আমরা তাঁদের দানের কথা স্মরণ করি।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন উইলিয়ম

কেরী সাহেব। তিনি এ দেশের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দিয়ে বাংলা গদ্য-পুস্তক রচনা করালেন ও নিজে তা প্রকাশ করলেন। প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থখানি। গ্রন্থটির রচয়িতা রামরাম বসু। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে যে বাংলা গদ্যের প্রবর্তন হয়েছে, বলতে গেলে এই রামরাম বসুই তার স্রষ্টা। তারপর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখলেন 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি গ্রন্থ। তারিণীচরণ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি ঈশপ ইত্যাদির গল্প অবলম্বন করে লিখলেন 'ওরিয়েন্ট্যাল ফেবুলিস্ট'। রাজীবলোচন লিখলেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান ভুলবার নয়।

বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দৌলতে। কিন্তু সে ভিত্তি সুদৃঢ় করতে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্মের সমর্থনে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভাব ও ভাষায় তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন করে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিসাধন করেছিলেন।



রামমোহন রায়

রামমোহনের বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'বেদান্তচন্দ্রিকা', 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামমোহনের পরই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মশাই পাঠ্যপুস্তক রচনা করে একদিকের অভাব পূরণ

করলেন ; অপরদিকে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অবলম্বন করে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলার গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। বাংলা ভাষায়--বিদ্যাসাগর আরোপ করলেন যতি। ফলে বাংলা গদ্য-সাহিত্য শোভন হয়ে এক নতুন রূপ ধারণ করল।


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের পরই নাম করতে হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের। এঁর আগে বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত বাংলা গদ্যের ভাষা সুললিত হয়ে থাকলেও সংস্কৃতানুসারিণী ছিল। সন্ধি-সমাসের বেড়াজাল এবং দুরূহ শব্দের ভার বাংলা সাহিত্যের স্বচ্ছন্দগতিকে পদে পদে ব্যাহত করছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র নতুন আদর্শ ও নতুন রচনাশৈলী নিয়ে লেখনী ধারণ করলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। প্রকাশিত হলো টেকচাঁদ ঠাকুর—এই ছদ্মনামে। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম। এই গ্রন্থের ভাষা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত হলো। তারপর থেকেই আলালী ভাষায় গ্রন্থরচনা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল।

পরবর্তীকালে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ করে আধুনিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ মনীষিবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় ছড়া কেটে ঢোল ও কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এমন গানের নাম তরজা। ছড়ার মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তর পদ্ধতিও বাংলায় প্রচলিত ছিল।

এর থেকেই কবিগানের উদ্ভব ঘটলো। বাংলায় কবিগান রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা ও অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী।

প্রাচীনকালে পাঁচালি নামে এক ধরনের গানেরও প্রচলন ছিল। মৃদঙ্গ ও চামর সহযোগে পাঁচালি গান গীত হতো। পাঁচালির মূল গায়ক একজন। তিনি আবার বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর অভিনয় করতেন। পাঁচালি গান ছাড়া আর ছিল ঝুমুর গান। এ গানে বিভিন্ন পাত্রী-পাত্রী নিজেদের কথা নিজেরাই বলতেন। সুতরাং বলা যায় যে যাত্রার পূর্বরূপ হচ্ছে ঝুমুর গান। দাশু রায় ছিলেন বাংলার একজন খ্যাতনামা পাঁচালিকার।

যাত্রা শব্দের অর্থ দেবদেবীর পূজা উৎসব উপলক্ষে শোভা-যাত্রা। ঐ সব উৎসব উপলক্ষে যে গান অভিনয় হতো কালক্রমে তাই যাত্রা নামে অভিহিত হলো। বাংলায় কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা এমনকি বিদ্যাসুন্দর যাত্রারও প্রচলন ছিল।

ইংরেজরা এদেশে আসার আগে যাত্রা, কবিগান, পাঁচালিগান ইত্যাদিরই প্রচলন ছিল। তখনও পর্যন্ত নাটক অভিনয় শুরু হয়নি। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডফ নামে এক রুশ দেশীয় ভদ্রলোক এদেশে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রঙ্গালয়ে লেবেডফ দুটি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বাঙ্গালী নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করান। বলতে গেলে সেই প্রথম বাংলা নাটকের সূত্রপাত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের সার্থক নাটক 'রত্নাবলী' বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। তারপর ধীরে ধীরে বাংলায় অনেক নাট্যশালা গড়ে ওঠে ও নিয়মিত নাটক অভিনীত হতে থাকে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আধুনিক যুগের বাংলা কাব্য ও নাটক রচনার পথপ্রদর্শক বলা চলে। তিনি প্রথম পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতি মিলিয়ে নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক-গুলির মধ্যে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' উল্লেখযোগ্য।

এর পর উল্লেখ করতে হয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' নাটক। নীলদর্পণ নাটকে সে যুগের নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী সার্থক রূপ নিয়েছিল। দীনবন্ধুর অলৌকিক সমাজজ্ঞান ও তীব্র সহানুভূতির ফলশ্রুতি এই নীলদর্পণ। দীনবন্ধু আবার হাস্যরসিকও ছিলেন—'সধবার একাদশী' তাঁর লেখা একখানি সার্থক প্রহসন।

এরপর নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও আরও কয়েকজন সার্থক বাংলা নাটক রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে। বয়স্করা চায় বাস্তবধর্মী গল্প। এই বাস্তবধর্মী গল্প শোনার কৌতূহল মেটাবার জন্য উপন্যাস ও ছোট গল্পের সৃষ্টি হলো। এই উপন্যাস ও ছোট গল্পের মধ্যে আমরা আমাদের চেনা মানুষকে খুঁজে পাই, দেখতে পাই আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছায়া।

উপন্যাস গল্প তো বটেই, অধিকন্তু উপন্যাসে গল্পের চরিত্র-গুলির বিকাশ ঘটে। উপন্যাসের পরিধি বিশাল। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে নানা সমস্যার অবতারণা ও তার সমাধানের পথ দেখাবার সুযোগ পান। অপর পক্ষে গল্পের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে জীবনের ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ প্রভৃতি। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের কথায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ছোটগল্প সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনায় ঘন ঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এ যুগের গদ্য-সাহিত্যের সম্রাট। রোমান্টিক উপন্যাসের পরিবর্তে তিনি বাস্তবধর্মী উপন্যাস সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর রচনায় ছিল জাতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, নীতিবোধ এবং শুভ্র সংযত হাস্যরস। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'দেবী-চৌধুরানী' প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালী স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা-গুরু, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবন-রচনার প্রথম শিল্পী।



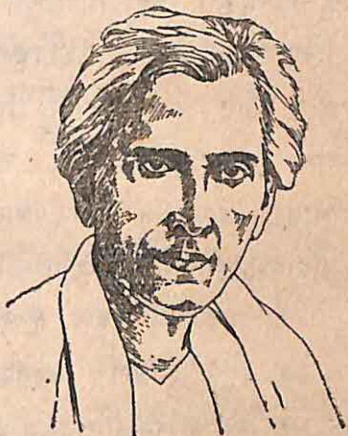
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমের অনুকরণে রমেশচন্দ্র দত্তও কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক। তাঁর 'মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা' যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'সংসার' ও 'সমাজ' উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাস লিখে গেছেন, ছোটগল্পও লিখেছেন। তাঁর লেখা 'সিন্দুর কৌটা', 'নবীন সন্ন্যাসী' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'ষোড়শী', 'গল্পাঞ্জলি' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমার ছোটগল্পের মধ্যে অনাবিল হাস্যরস পরিবেশন করে গেছেন।

উপন্যাসের মধ্যেও তিনি হাস্য-পরিহাসের অবতারণা করেন গেছেন। তাঁর ভাষা সরল, সরস ও উজ্জ্বল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করে গেছেন। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখ, সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের কথা ও আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনারীতি সহজ, ভাষা সরল ও মনোজ্ঞ। তাই শরৎচন্দ্র বাংলার এক অসাধারণ জনপ্রিয় সাহিত্যিক। নারী চরিত্র চিত্রণে শরৎচন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। বহু উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখে গেছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর 'কাশীনাথ', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ, 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। তাঁর লেখা গল্প 'মহেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পরিচয় আমরা দিয়েছি। এখন আলোচনা করা যাক আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী কবির ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করে নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত হন। বাংলার কাব্য-সাহিত্যে আসে নব যুগ।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনারীতি যদিও মধ্যযুগীয় তবুও তাঁকে আধুনিক যুগের কবিদের অগ্রদূত বলা চলে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত পরিচয় তাঁর রচনাবলীতে নয়—প্রকৃত সাহিত্যে সৃষ্টির প্রেরণায়।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিক ধারার প্রবর্তক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন অতুল কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব'। তাঁর দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বাংলা কাব্য সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য যুগান্তর এনেছে। তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উল্লেখযোগ্য।

বাংলার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের পর মাইকেল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তন করেন।

মধুসূদনের পরই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী', 'বীরবাহু' ও 'বৃত্রসংহার কাব্য' উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও বাঙ্গালীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী কবিতাও হেমচন্দ্র লিখে গেছেন। যেমন ঃ

বাজারে শিঙা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

হেমচন্দ্রের উত্তর-সাধকের মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র সেন ও কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক ঐতিহাসিক গাথাকাব্য সেকালে খুবই জনপ্রিয় হয়। তাঁর

আখ্যায়িকা কাব্য 'রঙ্গমতী' এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য 'প্রভাস', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'রৈবতক' বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে আধুনিক গীতি-কবিতার জনক আখ্যা দেওয়া চলে। 'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারদা। জায়া-জননী-কন্যা ইহার রূপ। সেই রূপেই কবি সারদা দেবীকে সারদামঙ্গল কাব্যে বন্দনা করেছেন।

সবশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় দেওয়া যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্দশক পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একাধিপত্য করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যে সর্বদাই একটি সার্বজনীন ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। তাঁর মত অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মনীষী বাংলা কেন পৃথিবীতেই দুর্লভ।


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'কড়ি ও কোমল', 'কথা ও কাহিনী', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙ্গালী কখনও ভুলতে পারবে না। 'গীতবিতান'-এর বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত গানগুলি বাংলার সঙ্গীত-জগতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য স্বরচিত গানে সুর সংযোজনের কৃতিত্বও তাঁর। তাঁর

'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা' প্রভৃতি গীতিনাট্য, 'গোরা', 'নৌকাডুবি', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার' প্রভৃতি গল্প বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি দিক হচ্ছে পত্র-সাহিত্য। 'ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি' ও 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের প্রতিভার স্বাক্ষর আজও বহন করে চলেছে। ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য ছড়া ও কবিতা রচনা করে গেছেন। ছোটদের উপযোগী নাটকও লিখেছেন। কি ভাষার কারুকার্যে, কি ভাব সম্পদে, কি কাব্য ও সাহিত্যরসে—সব দিক দিয়েই রবীন্দ্র-সাহিত্য অতুলনীয়।

বাংলার বিজ্ঞান সাধনা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের গৌরবের অংশীদার ছিল আমাদের এই বাংলা। কি শিল্প-বাণিজ্য, কি সাহিত্য-বিজ্ঞান—সব কিছুতেই বাংলার দানের স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। পাল ও সেন রাজারা বাংলার বাইরে ভারতের এক বিরাট অংশে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের আমলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যে বাংলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারেও বাংলার কৃতিত্ব কম নয়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙালী অতীশ দীপঙ্করের অবদান তো সবারই জানা আছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যক্ষ শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য সকলেই বিদিত। বাংলার রাজপুত্র বিজয়সিংহের সিংহল জয়ের কাহিনী বাঙালীর গর্বের বস্তু। মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে বাংলার ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ঐতিহাসিক শিলা-লিপিগুলি। বাংলার বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে বাঙালী নাবিক ও বণিকেরা সেকালে বিদেশে যেতেন বাণিজ্য করতে।

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজদের রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করার জন্য এদেশে কিছু সংখ্যক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী ও বাস্তুকার আসেন। ইউরোপীয় মিশনারীরাও আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশে থেকে

মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত হন। কতকগুলি গবেষণার ফল খুবই মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়। কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমান নাম 'শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল') স্যার রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়া সম্পর্কে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গবেষণার ভাষা ছিল বিদেশী। গবেষণার বিষয়বস্তু প্রকাশিত হতো বিদেশী পত্রিকায়। বিজ্ঞানী নিজে এবং বিদেশী সংস্থা লাভবান হতেন সে সব গবেষণার ফলে। এক কথায় তাঁদের গবেষণা এদেশের তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে পারত না। তাই তখনও পর্যন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা একেবারে অন্ধকারে ডুবে ছিল বলা চলে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাংলার এক খ্যাতনামা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ছিলেন। কলকাতার কাছে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁরই চেষ্টায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অভ সায়েন্স) প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজের পাঠ শেষ করে ছাত্রেরা যাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার সুযোগ পায়, সেই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলালের আজীবন সঞ্চিত অর্থে স্থাপিত হলেও বহু দানশীল ব্যক্তির বদান্যতায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের আবিষ্কারে এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে।

যতদূর জানা হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয়, যিনি বিদেশে না গিয়ে স্বদেশে বসেই মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল গণিত। নিজের চেষ্টায় তিনি গবেষণা

করেছিলেন। তাঁর কতকগুলি গবেষণা-নিবন্ধ বিদেশেও যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু পরে আশুতোষ আইনজ্ঞ হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে তাঁর গবেষণা গেল বন্ধ হয়ে।


আচার্য জগদীশচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বাংলার দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। আচার্য বসুর জন্ম হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। আর আচার্য রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। আচার্য বসু ছিলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী আর আচার্য রায় রসায়ন-বিজ্ঞানী। এঁরা দুজনেই ইংল্যাণ্ডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মারকিউরাস নাইট্রেট সম্পর্কিত গবেষণা দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসা পায়। আর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। এঁদের গবেষণার সাফল্য বাংলার তরুণ বিজ্ঞানীদেব অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। বলতে গেলে এঁরাই বাংলার আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষকদের পথ প্রদর্শক।


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

স্যার আশুতোষ আইনজ্ঞ হিসাবে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও দেশে শিক্ষা ও গবেষণা সংগঠনে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। গণিত

বিজ্ঞান গবেষণায় প্রেরণা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা গণিত সমিতি' স্থাপিত হয়। তারপর ১৯১২-১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস' সমিতি। সমিতির উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানের সকল শাখার গবেষণায় উৎসাহ দান।



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উৎসাহে স্থাপিত হয় 'ভারতীয় রসায়ন সমিতি'। মেঘনাদ সাহা, দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশির মিত্র প্রমুখ খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে 'ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি'। এইসব সমিতি বক্তৃতা, আলোচনা সভা, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছে।

এইসব সমিতি প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য কলকাতাতেই সর্ব প্রথম এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা কাল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে কলকাতার এই এশিয়াটিক সোসাইটি সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির নামকরণ হয় 'বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি।' বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান শুধু 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে পরিচিত।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার, বিশেষ করে পুরাতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণা শুরু হয়। পুরাতত্ত্ব বলতে আমরা বুঝি প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, চিত্র, অনুশাসন, বিভিন্ন অক্ষরে খোদিত লিপি,

মুদ্রার উপর রাজ-রাজড়ার পরিচয় কাহিনী ইত্যাদি। পুরাতন লিপি-পাঠও পুরাতত্ত্ব বিদ্যার একটি অঙ্গ।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তার দু'বছর পরেই কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এই বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আচার্য বসু বলেছিলেন: 'বিজ্ঞান অনুশীলনের দুটি দিক আছে। প্রথমত নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার—এইটাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তারপর, জগতে সেই নতুন তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা গৃহ তৈরী হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তার পরীক্ষার জন্য এরকম গৃহ বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোথাও তৈরী হয়নি। দেড় হাজার শ্রোতার এখানে সমাবেশ হতে পারে। এখানে কোন বহু-চর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব আবিষ্কার হয়েছে এই মন্দিরে সেই সব নতুন সত্য পরীক্ষা সহকারে সর্বত্র প্রচারিত হবে। সর্ব জাতির সকল নর-নারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকবে।'

সরকারী চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর জীবনের শেষ কুড়ি বছর এই বিজ্ঞান-মন্দিরে বসেই গবেষণা করছিলেন আচার্য বসু। আজ এই বিজ্ঞান-মন্দির বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থান।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং সর্বশ্রী তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, রানী বাগেশ্বরী, কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমুখ দাতাদের দানে ১৯১৪

খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিজ্ঞান কলেজ'-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরের বছর থেকেই এখানে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলার সর্বত্র নবজাগরণের জোয়ার আসে। দেশকে মহৎ ও শক্তিশালী করবার জন্য বাঙ্গালী তরুণদের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। তরুণ বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান গবেষণার প্রগতির প্রেরণা পান। এই বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করেই জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তড়িৎ রসায়নে 'ঘোষ তত্ত্ব' প্রকাশ করেন। মেঘনাদ সাহা জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানে 'তাপ আয়নন সূত্র' আবিষ্কার করেন। কলকাতায় বসে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন 'রামন বিকিরণ' আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সত্যেন বসু, শিশির মিত্র, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়দারঞ্জন রায়, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ বিখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা এই বিজ্ঞান কলেজেই তাঁদের গবেষক জীবন শুরু করেন। তাঁদের সার্থক গবেষণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বের বস্তু—বাঙ্গালীর গর্বের বস্তু। আজও এই বিজ্ঞান কলেজ নতুন বিজ্ঞানী সৃষ্টি করে চলেছে।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের প্রচেষ্টায় কলকাতায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট'। শুধু ভারত কেন, সমগ্র এশিয়ায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আর দ্বিতীয় নেই। এখানকার গবেষণাগারে জনসংখ্যা, খাদ্যশস্য উৎপাদন, জীবন-যাত্রার মান, শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন, কর্মবিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা হয়। এখানকার কয়েকজন পরিসংখ্যান বিজ্ঞানীর মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

কলকাতার 'স্কুল অভ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন' পশ্চিম বাংলায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার প্রাণকেন্দ্র। গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় রোগ, পরজীবীতত্ত্ব এবং ভেষজ উদ্ভিদের গবেষণাকেন্দ্ররূপে এটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ-রোগ, চর্মরোগ, রক্ততত্ত্ব এবং পরজীবী সম্পর্কে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বঙ্গদেশ নদী-মাতৃক দেশ। নদ-নদীর বন্যারোধ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে তাই এদেশে গবেষণার প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে 'নদী বিজ্ঞান গবেষণাগার'। উদ্যোক্তা সতীশচন্দ্র মজুমদার ও মেঘনাদ সাহা।

'কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার' বাংলার আর একটি উল্লেখ-যোগ্য গবেষণাগার। এখানকার গবেষণা কাচ, মৃৎবিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি-বিদ্যার মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে সীমিত। ফোম গ্লাস, অপটি-ক্যাল গ্লাস, ফায়ার ব্রিক্স্ প্রভৃতি এই গবেষণাগারেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

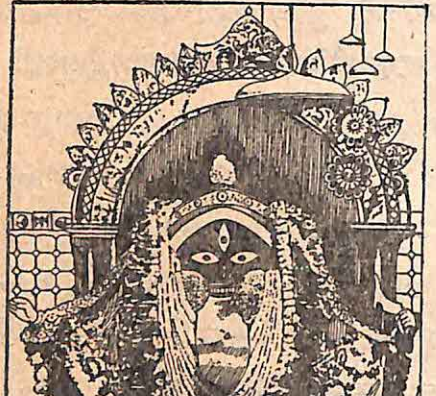
এ ছাড়াও পশ্চিম বাংলায় আছে আলিপুর আবহতত্ত্ব বীক্ষণাগার, ভারতীয় নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সমীক্ষা, সাহা ইনস্টিট্যুট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কেন্দ্রীয় ভেষজ-গবেষণাগার, পাট গবেষণাগার প্রভৃতি। পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানও তাঁদের নিজস্ব গবেষণাগারে শিল্প ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলার তরুণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্র এখন অনেক প্রশস্ত। বাংলার বিজ্ঞান-সাধকদের ভবিষ্যৎ এখন অনেক উজ্জ্বল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে ঃ

ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্বাদে।

বাংলার তীর্থক্ষেত্র

দেব-দেবীর পীঠস্থান হিসাবে বাংলার প্রসিদ্ধি দীর্ঘকালের। বাংলার তীর্থক্ষেত্রগুলি যুগ যুগ ধরে ভারতের সকল প্রদেশের তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে আসছে। আজও বাংলার তীর্থক্ষেত্রগুলির মাহাত্ম্য অম্লান। বাংলার সব কটি তীর্থক্ষেত্রের পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। তাই কয়েকটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো এই অধ্যায়ে।

১। কালীঘাট ঃ কলকাতার কালীঘাট হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। কালীঘাট একটি মহাপীঠ। এখানে সতীর ডান পায়ের চারটি আঙ্গুল পড়েছিল। কালীঘাটের দেবীর নাম কালিকা এবং ভৈরব নকুলেশ্বর। দেবীর মন্দিরের কিছু দূরে নকুলেশ্বরের মন্দির। মায়ের মন্দিরের প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে আদিগঙ্গা।



কালীঘাটের কালীমূর্তি

কালীঘাটের কালীমূর্তি পাষাণময়ী। দেবীমূর্তির অধোভাগ অদৃশ্য। কটিদেশ থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গ নানারকম মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত এবং জিহ্বা স্বর্ণমণ্ডিত। এই মহাপীঠকে উপলক্ষ্য করেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন ঃ

এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র কাহিনী ইহার সবার শ্রুত।
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত ॥

কালীঘাটের আদি মন্দির যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় তৈরি করেছিলেন। বর্তমান মন্দিরটি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় তৈরি করেন। তারপর অবশ্য এ মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়েছে অনেকবার।

কালীঘাটের কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দির। সেখানে চণ্ডীপাঠ হয়, ধর্মালোচনা হয়। নাটমন্দিরের ডান দিকে পশুবলির স্থান। কালীঘাটের মন্দিরে নিত্যই লোকের ভিড়, নিত্যই মহোৎসব।

মন্দির-চত্বরে প্রবেশের প্রধান ফটকের বাঁদিকে আর একটি মন্দিরে আছে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। বাওয়ালীর জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দির পর্ণকুটীরের অনুকরণে বিশুদ্ধ বাংলা পদ্ধতিতে নির্মিত।

২। **দক্ষিণেশ্বর :** শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ও বাসে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া যায়। ট্রেনে গেলে নামতে হয় দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ি মাত্র দুই-তিন মিনিটের পথ।

কালীবাড়ি গঙ্গার ঠিক উপরেই অবস্থিত। বাঁধা ঘাট, চাঁদনী ও দ্বাদশ শিব-মন্দিরযুক্ত এই কালীবাড়ির দৃশ্য গঙ্গাবক্ষ থেকে অতি সুন্দর। কলকাতার জানবাজারের পুণ্যশীলা রানী রাসমণি এই কালী-বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। এককালে এই কালীবাড়ি রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সাধনপীঠ ছিল। রামকৃষ্ণদেবের সাধন-বেদী ও পঞ্চবটী

এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। কালীমন্দিরের চূড়ার সংখ্যা নয়টি। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির ও উত্তরদিকে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির।

৩। বেলুড় মঠ: ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ও দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে বেলুড় মঠ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এখানে পাথরে গড়া একটি বড় মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মধ্যে রামকৃষ্ণ-দেবের চিতাভস্মের উপর তাঁর একটি সুন্দর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেলুড় মঠ ও তার পরিবেশ অতি সুন্দর। মঠের নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দির।

৪। মায়াপুর: নবদ্বীপঘাট থেকে নৌকাযোগে জলঙ্গী নদী পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মায়াপুরে যেতে হয়। নবদ্বীপঘাট স্টেশন থেকে মায়াপুরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এইটিই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান।

নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে লেখা আছে:

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
তথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

শাস্ত্রমতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে 'যোগপীঠ' বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর মতে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মস্থান বলে বর্ণিত হয়েছে।

যাই হোক মায়াপুর হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান।

এখানকার শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির অতি সুন্দর। মন্দিরের চূড়াটি সারাবছর রাত্রিকালে আলোকমালায় সাজানো থাকে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্যের বিগ্রহ বিরাজমান।

মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে ক্ষেত্রপাল নামক শিব-মন্দির। মন্দিরের পাশে নিমগাছতলায় শচীমাতার সূতিকা গৃহ। সেখানে শয়ান শিশু নিমাই। কাছে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট।



যোগপীঠ মন্দির—মায়াপুর

যোগপীঠ-মন্দিরের পূর্বদিকে নৃসিংহ-দেবের মন্দির আর উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন। শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণসহ সঙ্কীর্তনরত গৌর-নিমাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত আছে।

এ ছাড়া মায়াপুরে আছে শ্রীচৈতন্যমঠ। মঠের মোট ঊনত্রিশটি চূড়া আছে। মাঝখানের গোলাকৃতি চূড়াটিও তার উপর স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজ বহুদূর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঠের মধ্যে গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি নিত্য পূজিত হন। শ্রীচৈতন্যমঠের শিল্প-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

৫। **তারকেশ্বর ঃ** তারকেশ্বর হুগলী জেলায় অবস্থিত বাংলার এক বিখ্যাত শৈবতীর্থ। দশনামী শৈব-সম্প্রদায়ের প্রধান মঠটি এখানে অবস্থিত। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করে, নানা মত খণ্ডন করে, বেদান্ত শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের চারটি স্থানে চারটি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গগিরিতে

শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ এবং বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। শঙ্করাচার্যের শিষ্যেরাও গুরুর মতন নানা দেশে ভ্রমণ করেন এবং শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা প্রচার করেন।

শঙ্করাচার্যের চারজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁরা হলেন পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই চারজন শিষ্যের দশজন শিষ্য থেকে পরবর্তীকালে দশনামী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তারকেশ্বরের মঠ এই দশনামী শৈবরা প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের প্রতিষ্ঠাতা সমুদ্রনাথ গিরি। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭২৯ সাল। তারকেশ্বরের শিব 'তারকনাথ' নামে পরিচিত। মন্দিরে তারকনাথের বাঁ পাশে বাসুদেব। পটাঙ্কিতা দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালিকাও পাশে আছেন। তারকনাথের সঙ্গে তাঁদেরও নিত্যপূজা হয়। তারকেশ্বর শুধু শৈবতীর্থই নয়, শক্তিপূজা, গাজন উৎসব ও অন্যান্য লোকাচারের মহাসঙ্গমতীর্থ।

বাংলায় শিবঠাকুরের চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ন্যাস ও গাজন উৎসব সবচেয়ে জাঁকাল উৎসব। এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় তারকেশ্বরে। চৈত্রের প্রথম থেকে তারকেশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণ ও মেলা আরম্ভ হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রধানত পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে আসেন।

এখানকার নীলের মেলাটিও হয় বিরাট আকারে। নীলাবতীর বিয়ে হয় এবং হাতি সহ শোভাযাত্রা বেরোয়। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়ে-পুরুষ ভক্তরা কাল্‌কেপাতারি নাচ দেখান। এমনিভাবে শিবার্চনা ছাড়াও চার দিকের লোকানুষ্ঠানের মহামিলন হয় তারকেশ্বরে।

৬। **তারাপীঠ:** তারাপীঠ বীরভূম জেলায়। তারাপীঠে আছে তারাদেবীর মন্দির। আধুনিক কালে তৈরি চারচালা বাংলা মন্দির।

অনেক ভাঙ্গাগড়ার পর তৈরি হয়েছে এ মন্দিরটি। পাশেই দ্বারকা নদীর কোলে শ্মশান। পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো পর্ণ-কুটীর আর কিছু আশ্রম। তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে জন্মেছিলেন সাধক বামাক্ষেপা। তারাপীঠে এসে বামাক্ষেপা তারার আরাধনায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। তারাপীঠ বাংলার তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থান।

তারার নামেই তারাপীঠ। 'তারা' যে শুধু সাধক বামাক্ষেপারই মুখের বুলি ছিল তা নয়—বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই এই তারা নামের ভক্ত। দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা—সবই তারা। তারা সাধনায় সাধকরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে তারাপীঠকে অনেকে সিদ্ধপীঠ বলে থাকেন। শিব-চরিত গ্রন্থে তারাপীঠকে মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সতীর নেত্রাংশ 'তারা' নাকি এখানে এসে পড়েছিল, যার জন্য নাম হয়েছে তারাপীঠ। তারাপীঠে আছেন দেবী 'তারিণী' আর ভৈরব 'উন্মত্ত'।

তারাপীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেটি এই রকম ঃ

ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ। তিনি তারামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কামাখ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থানে গিয়ে কঠোর তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। শেষে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপদেশ চান। বুদ্ধদেব নাকি তারাপীঠে গিয়ে উগ্রতারার সাধনা করতে বলেন। বশিষ্ঠ তাই করেন এবং সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। তারাপীঠের সকলের বিশ্বাস—বশিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এই তারাপীঠেই। তারাপীঠের একটি কুণ্ড আজও বশিষ্ঠকুণ্ড নামে খ্যাত। লোকের বিশ্বাস যে, এই বশিষ্ঠকুণ্ডে স্নান করলে মৃতবৎসা

নারী সন্তান লাভ করে। বশিষ্ঠের সাধনার স্থানটিও নির্দিষ্ট আছে তারাপীঠে।

৭। গঙ্গাসাগর : ডায়মণ্ডহারবার থেকে স্টিমার যোগে দক্ষিণ দিকে গেলে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ গঙ্গাসাগর বা সাগর দ্বীপে পৌঁছানো যায়। ডায়মণ্ডহারবার থেকে গঙ্গাসাগর দ্বীপের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ মাইল। প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির সময়ে এখানে প্রসিদ্ধ মকর-স্নানের মেলা হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস এই মহাতীর্থে স্নান করলে লোকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে এখানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণে অনন্ত ফল লাভ হয়।

পুরাণে আছে রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ স্থানীয় পিতৃপুরুষ অযোধ্যারাজ সগর নিরানব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পর শতবার পূর্ণ করার জন্য আবার যজ্ঞের আয়োজন করলেন। স্বর্গরাজ ইন্দ্রও শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সগর রাজার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ হতে চলেছে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র উদ্বিগ্ন ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। কারণ তাহলে তাঁর কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যাবে। ইন্দ্র তখন যজ্ঞের জন্য ছেড়ে দেওয়া সগর রাজার ঘোড়াটি চুরি করলেন। কপিল মুনি যেখানে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তারই নীচে একটি ঘরে ইন্দ্র যজ্ঞের ঘোড়াটিকে লুকিয়ে রাখলেন।

এদিকে সগরের ষাট হাজার ছেলে নানা দিক খোঁজ করার পর ঘোড়াটিকে পেয়ে মনে করলেন যে কপিল মুনিই বুঝি ঘোড়াটি চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই মনে করে তাঁরা মুনিকে আঘাত করায় মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়। মুনি চোখ খুলে তাঁদের দেখে অভিশাপ দেন আর তাতে সগর সন্তানেরা ভস্মীভূত হয়ে নরকে বাস করতে থাকেন।

কপিলমুনি বিধান দিয়েছিলেন যে ভস্মস্তূপে যদি গঙ্গার ধারা

বইয়ে আনা যায় তাহলে অভিশপ্ত সগর সন্তানেরা মুক্তি পাবে। সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ বহু তপস্যার পর গঙ্গাদেবীকে মর্তে আনতে সক্ষম হন। কথিত আছে—ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে সমুদ্রের কাছে চব্বিশ পরগনার হাতিয়াগড় পর্যন্ত নিয়ে এসে আর পথ খুঁজে পাননি। সগর পুত্রদের ভস্মে গিয়ে নিশ্চিতরূপে পৌঁছাবার জন্য গঙ্গা তখন শতভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হলেন। এইভাবে গঙ্গার বিভিন্ন মোহনা ও ব-দ্বীপ সৃষ্টি হলো। একটি ধারা দিয়ে সগর পুত্রদের ভস্মরাশি ধুয়ে নিয়ে গঙ্গাদেবী তাঁদের আত্মার সগদতি করলেন।

গঙ্গাসাগরে গঙ্গাদেবী, কপিলমুনি, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্তি আছে। যাত্রীরা স্নানান্তে এই মূর্তিগুলি দর্শন করেন। বর্তমানে সাগর দ্বীপে কপিলমুনির একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮। **বক্রেশ্বর :** বক্রেশ্বর বীরভূম জেলায়—সিউড়ী থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাংলার শৈবতীর্থগুলির মধ্যে বক্রেশ্বর অন্যতম। পুণ্যলোভাতুর যাত্রীরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য দেশ-দেশান্তর হতে আসেন বক্রেশ্বর তীর্থে। তবে তান্ত্রিক সাধক ও বাউলরাই বেশী আসেন এখানে। অষ্টাবক্র মুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পার্বতীনাথ বলেছিলেন : তোমার পূজার পর ভক্তেরা আমার অর্চনা করবে। আর তুমি যে স্থানে বসে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছ, সেই স্থানটি সিদ্ধপীঠ হিসাবে খ্যাত হবে।

বক্রেশ্বরকে বলা চলে 'দেবগ্রাম'। এখানে মানুষের বাস দেবতার প্রয়োজনে। মনুষ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে দেবালয়ের সংখ্যাই বেশী। এখানকার মন্দিরগুলির অধিকাংশই খাঁটি চারচালা বাংলা মন্দির। বাংলা মন্দির ছাড়া ছোট ছোট রেখ-মন্দিরও অনেক আছে

বক্রেশ্বরে। বক্রেশ্বরে আছেন 'বক্রনাথ'। বক্রনাথের মূল মন্দিরটি বেশ বড় এবং উড়িষ্যার রেখ-দেউলের অনুরূপ।

বক্রেশ্বর 'গুহ্যতীর্থ' অর্থাৎ গুহ্য সাধনার অন্যতম কেন্দ্র। তীর্থ-ক্ষেত্রের পূর্বে ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদ। দক্ষিণে পাপহরা নদী। তার পাশেই শ্মশান। এই শ্মশানের উপরই ছিল বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক অঘোরীবাবার আস্তানা।

শৈবতীর্থে শক্তিও বিরাজ করেন। তাই বক্রেশ্বরেও আছেন মহিষমর্দিনী দেবী। বক্রেশ্বরে ভৈরবকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি অনেকগুলি কুণ্ড আছে। সব কুণ্ড থেকেই বেরিয়ে আসছে ফুটন্ত জল। সে জলে গন্ধকের গন্ধ। এই সব কুণ্ড ও প্রস্রবণের সঙ্গে কিন্তু বক্রেশ্বর তীর্থের কোন সম্বন্ধ নেই। এগুলি বক্রেশ্বর পীঠস্থানের এলাকার মধ্যে অবস্থিত—এইমাত্র।

৯। **জল্পেশ্বর**ঃ জলপাইগুড়ি শহর থেকে নয় মাইল দূরে বিখ্যাত জল্পেশ্বর মন্দির। জল্পীর অধিষ্ঠাত্রী দেবরূপে এখানকার প্রাচীনতম শিবলিঙ্গ 'জল্পীশ' নামে খ্যাত। সেই জল্পীর নাম থেকেই জল্পেশ্বর নামের উৎপত্তি। প্রবাদ আছে যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর (বর্তমান গৌহাটি)-এর রাজা জল্পেশ্বর গভীর অরণ্য মধ্যে এই শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন। তারপর মন্দির নির্মাণ করে নিজের নামে শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন। আদি মন্দির ধ্বংস হয়ে যায় কালের কবলে। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের চূড়ায় একটি গোলাকৃতি গম্বুজ আছে। মন্দিরের প্রথম তলটি চারকোণা এবং প্রত্যেক কোণে একটি করে ঘর আছে। শিবরাত্রির মেলার সময় এখানে বহু ভক্ত সমাগম হয়।

বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি প্রাচীনকাল থেকেই দূর-দূরান্তরবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তাই বাংলা যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে বিদেশী পর্যটককে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এসেছিলেন বাংলায়। তারপর একে একে আরও অনেক বিদেশী পর্যটককে আকর্ষণ করেছে বাংলা। সেইসব বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে হিউয়েন সাঙ, মহুয়ান, রালফ ফিচ্ ও বানিয়ার অন্যতম। ইতিহাসের সেই পুরনো দিনেই যদি বঙ্গদেশ বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে থাকতে পারে তবে আজ তো করবেই। আর করছেও তাই। আজকাল বলতে গেলে সারা বছরই বাংলায় পর্যটকদের আনাগোনা।

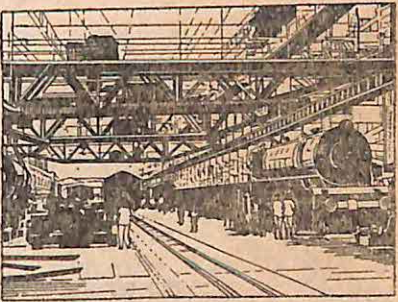
বাংলার মত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈচিত্র্য অল্প স্থানেই আছে। শস্য-শ্যামল প্রান্তর, আর তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম—এইটাই বাংলার সাধারণ গ্রামীণ দৃশ্য। গ্রাম-বাংলার এই রূপ শহরবাসী পর্যটকদের চোখ জুড়ায়।

১। কলিকাতা : পর্যটকেরা পশ্চিম বাংলায় এসে প্রথমেই আকৃষ্ট হন রাজধানী কলকাতার প্রতি। কলকাতার দর্শনীয় স্থান ও বস্তু অগণিত। এখানকার যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, প্ল্যানেট্যারিয়াম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, পরেশনাথের মন্দির, শহীদ-মিনার, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি সব শ্রেণীর পর্যটকেরই প্রশংসা অর্জন করে। কলকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়।

ব্যাণ্ডেল গীর্জাকে উপহার দেন। তিনশো বছরেরও আগে উপহার দেওয়া পতাকাদণ্ডটি আজও অটুট রয়েছে।

৫। **মুর্শিদাবাদঃ** কলকাতা থেকে একশো বাইশ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ। শহরটি স্টেশন থেকে প্রায় দু-মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে। এই মুর্শিদাবাদ হলো স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী। এখানে ছড়িয়ে আছে নবাবী আমলের বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন। এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় হাজারদুয়ারী। নবাব নাজিম হুমায়ুনজা এই বিশাল প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন। হাজারদুয়ারীর উত্তরে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া—বাংলার সবচেয়ে বড় ইমামবাড়া। পর্যটকদের কাছে এই হাজারদুয়ারী ও ইমামবাড়ার আকর্ষণ কম নয়।

৬। **চিত্তরঞ্জনঃ** পশ্চিম বাংলা ও বিহারের সীমান্তে আসানসোল মহকুমায় চিত্তরঞ্জন শহর। এখানেই গড়ে উঠেছে 'চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা'। দেশ-বরেণ্য নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে এই কারখানার নামকরণ করা হয়েছে। শিল্প-নগরী চিত্তরঞ্জন নব্য বাংলার এক গৌরবময় স্থান।



চিত্তরঞ্জন কারখানার একাংশ

৭। **শান্তিনিকেতনঃ** বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন সত্যই শান্তির নিকেতন। এই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি। তাই বিদেশী পর্যটকেরা বাংলায় এসে শান্তিনিকেতন দেখে যেতে ভোলেন না।

২। দীঘা : বাংলার সাগর ছোঁয়া গ্রাম দীঘা। কলকাতা থেকে প্রায় আশী মাইল দূরে—মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলে দীঘা অবস্থিত। দীঘার শান্ত সাগর, কঠিন তটভূমি ও তার ঝাউবনের সৌন্দর্যের তুলনা মেলে না।

৩। দার্জিলিং : বাংলায় হিমালয়ের নামমাত্র অংশ পড়েছে। কিন্তু হিমালয়ের সেই নামমাত্র অংশেই বাংলার শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস দার্জিলিং অবস্থিত। দার্জিলিং শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে হিমালয়ের যে রূপ দেখা যায় এক কথায় তা অনবদ্য। টাইগার হিল থেকে চির-তুষার হিমালয়ের গায়ে সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া জীবনের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। উদীয়মান সূর্যের আলোকচ্ছটা বরফের গায়ে পড়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দার্জিলিঙের কাছাকাছি কালিম্পং এবং কার্শিয়াংও জনপ্রিয় শৈলবাস।

৪। ব্যাণ্ডেল : হাওড়া থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে ব্যাণ্ডেল। পর্তুগীজরা ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বাংলার সবচেয়ে পুরনো রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। 'লেডি অভ দি রোজারী'র উদ্দেশ্যে এ গীর্জাটি উৎসর্গীকৃত। প্রতি বছর বহু ভক্ত এখানে সমবেত হন। এই গীর্জার প্রাঙ্গণে একটি উঁচু পতাকাদণ্ড আছে। এই পতাকাদণ্ডটির সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে। জনশ্রুতিটি এই রকম : কোনও এক পর্তুগীজ জাহাজ এক সময় বঙ্গোপসাগরে এক প্রবল ঝড়ের ভিতর পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে জাহাজটি রক্ষা পায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের পতাকাদণ্ডটি


ব্যাণ্ডেলের গীর্জা

শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা কবিগুরুর এক অক্ষয় কীর্তি। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনেকখানি।

৮। দুর্গাপুর ঃ নব্য বাংলার আর একটি গৌরবময় স্থান হচ্ছে দুর্গাপুর। বর্ধমানের অনতিদূরে গড়ে উঠেছে শিল্পনগরী দুর্গাপুর। দুর্গাপুরে রয়েছে বাংলার অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত উৎপাদন কারখানা। ভারতের শিল্পায়নে এই দুর্গাপুর কারখানার অবদান নেহাৎ কম নয়। দুর্গাপুরে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য চুল্লী, চিমনি, জলের ট্যাঙ্ক, পেট্রোল পাম্প ও অসংখ্য সব যন্ত্রপাতি। দেখে মনে হয় বিশ্বকর্মার এই সৃষ্টিতে যেন অসংখ্য হোমানল জ্বলছে।

কলকাতার কাছাকাছি ডায়মণ্ড হারবার, ফ্রেজারগঞ্জ, বকদ্বীপ ইত্যাদিও দর্শনীয় স্থান। উত্তর বাংলার জলদাপাড়া ও গরুমারার অভয়ারণ্য স্বাভাবিক পরিবেশে জীব-জন্তুদের দেখার পক্ষে একটি আকর্ষণীয় স্থান। শিকারীদের কাছে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শিকার করা তো জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসী আশা। কাজেই এ সব স্থান তো বটেই, আরও অনেক দর্শনীয় স্থান ছড়িয়ে আছে বাংলার চারিদিকে। এদের সকলের পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। তাই অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের পরিচয় দেওয়া হলো এখানে। এগুলির সব কটিই বাংলার দর্শনীয় স্থানের তালিকায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

বাংলার বাউল

দ্বাদশ শতক এবং তার পরবর্তী যুগে ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কয়েকটি মতবাদ বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। সেই সব ধর্মমতকে আশ্রয় করে নতুন এক ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল এ দেশে। সেই ধর্মই 'বাউল ধর্ম'। কবে কি ভাবে এই ধর্মের প্রথম প্রবর্তন হয় তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এটি যে ভারতীয় ধর্মসাধনার এক অবিচ্ছেদ্য ধারা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর সন্দেহ নেই যে হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও ইসলামের সুফীমত দ্বারা বাউল ধর্ম ও সাধনা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। সর্বজন গ্রাহ্য এই মতবাদটি 'মনের মানুষ'—এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাউল ধর্ম এবং তার সাধকদের বিষয় আলোচনা করবার আগে 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে কিন্তু নানান পণ্ডিতের নানান মত। যেমন কেউ কেউ বলেন যে 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'ল' প্রত্যয় যোগ করে বাউল শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এখানে বায়ু শব্দের অর্থ যোগ শাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সাধন করার সাধনা করেন, তাঁরাই বাউল। আবার কেউ কেউ বলেন—তা নয়। বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস। আর শ্বাস-প্রশ্বাস মানেই জীবন-ধারণ। এই জীবন-ধারণের উপযুক্ত পথ চলে দীর্ঘ-জীবন লাভ করার সাধনা। এই সাধনা যাঁরা করেন তাঁরাই বাউল। আবার কোন কোন পণ্ডিতের

মতে সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ বাউল। যাঁদের আচরণ সাধারণের মত নয়, লোকে তাঁদের পাগল বা বাতুল বলে থাকেন। এই রকম সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহার সম্পন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে 'বাউল' বলা হয়।

বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে সত্যি, কিন্তু বাউলদের ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

'কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হায়রে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

বাউল গানের এই যে মনের মানুষ—এইটিই বাউল মতবাদের মূল কথা।

বাউলের দেহের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন মনের মানুষের উপস্থিতি। তাদের কাছে ভগবানের চেয়েও কাম্য এই মনের মানুষ। তাঁদের কাছে দেহ শুধু মাত্র দেহই নয়—দেহভাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড। ইষ্টসিদ্ধির জন্য মুক্তিকামীর পক্ষে দেব-উপাসনার প্রয়োজন নেই,—প্রয়োজন নেই তীর্থ ভ্রমণের। মানব দেহের মধ্যেই রয়েছে তীর্থস্থান, পুণ্যভূমি, দেবমন্দির, দেবদেবী—সব কিছু।

এই মনের মানুষ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

মানুষের দেবতা, মানুষের মনের মানুষ। আমরা জ্ঞানে, কর্মে, ভাবে যে পরিমাণ সত্য হই—সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই। অন্তরে বিকার ঘটলে সেই মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সব সেই আপন মনের

মানুষকে হারিয়ে। আপনাকে তখন আমরা টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না।

আমাদের দেশের বাউল বলে গেছেন ঃ

মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ
একবার দিব্য চক্ষু খুললে দেখতে পাবে সব ঠাঁই।

সেই মনের মানুষই সকল মনের মানুষ। আপন মনের মাঝে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মাঝেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বাউল সঙ্গীতের মাধ্যমে কিন্তু একটি মাত্র মতবাদ বা জীবন দর্শন প্রচারিত হয়নি। এর সর্বত্রই উপনিষদ প্রচারিত আদর্শ অনুসৃত হয়নি। বাউল গানে একাধিক মতবাদের অবতারণা করা হয়েছে। অন্তরের গভীরে কয়েকটি তত্ত্বকে বাউলরা গভীর সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন। সেই পরম তত্ত্বকে তাঁরা গানের ভাষায়-সুরে-ছন্দে-তালে-লয়ে নৃত্যের ভঙ্গীতে সাবলীলভাবে প্রকাশ করে গেছেন।

বাউলদের ধর্মমতে মন্ত্রের স্থান নেই। তাদের সাধন-রীতিতে আছে স্বতঃস্ফূর্তভাবের গান ও নাচ। নাচের সময়কার অঙ্গচালনা অর্থহীন। কিন্তু গানের তত্ত্ব ও ভাবকে নাচের দেহ-ভঙ্গীর ব্যঞ্জনায় তারা রূপ দেয়। তাদের গানে যেমন আছে উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাব, তেমনি আছে গভীর ভাবের দেহতত্ত্ব। যেমন ঃ

মানব দেহখান, আছে কতরূপ বাগান
কোলকাতা তার কোথায় লাগে, ইংরাজের নির্মাণ।
আছে চৌদ্দ পোয়ায় চৌদ্দ ভুবন
খোদ খোদা করে তৈয়ার
মানবদেহের কোলকাতায় হয় কি তা চমৎকার ॥

এর ভাবার্থ ঃ চৌদ্দ পোয়া হচ্ছে এই দেহ—সাড়ে তিন হাত। এই চৌদ্দ পোয়াযুক্ত দেহ মধ্যে আছে বিভিন্ন চক্র। বিভিন্ন চক্র ভেদ করে উর্ধ্বগামী হওয়াই বাউলদের সাধনার উদ্দেশ্য—তাতেই হয় সিদ্ধি। চৌদ্দ পোয়ায় আছে চৌদ্দ ভুবন। বাউলদের কথায়ও আছে—'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে দেহভাণ্ডে।' সাড়ে তিন হাত দেহ মধ্যে সব কিছুই আছে। বাউলেরা এইরকম ধারণাই পোষণ করেন।

জগতে সব কিছুই অনিত্য। কিছুই থাকবে না। তবু মানুষের কত সাধ—কত অহঙ্কার! এই মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগাতে, বৈষয়িক ব্যাপারে বীতরাগ জাগাতে বাউলেরা গান বেঁধেছেন। সেই গানে তাঁরা বলেছেন যে, মানুষের জীবন জলের বুদ্‌বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী। তবুও এ সংসারে কেউ বিত্তশালী হয়ে জীবন ভোগ করেন; আবার কেউ-বা সর্বত্যাগী ফকির হয়ে জীবন যাপন করেছেন। কি আশ্চর্য!

'দেখ ভাই জলের বুদ্‌বুদ্ কিবা অদ্ভুত
দুনিয়া এই আজব খানা,
কেউ-বা বিত্ত লয়ে বাদশা হয়ে রংমহাল করছে আলা
কেউবা তল্‌পী লয়ে ফকির হয়ে
গাছতলাতে করছে মেলা
দেখ ভাই জলের বুদবুদ—।'

বাউলদের সাধনা, গুরুকে আশ্রয় করে। তাঁদের মতে গুরু তিন রকম—শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু আর মূলগুরু। ওঁদের গানেও এই গুরুতত্ত্ব ফুটে উঠেছে ঃ

গুরু হন জগৎপতি
মন্ত্রদাতা ইনি ত্রাতা, এরূপে সে রূপের স্থিতি।
গুরুতত্ত্ব সকলের সার
গুরুর উপর বস্তু নাই আর
গুরু ব্রহ্ম এই সারাৎসার জানিবে সম্প্রতি।
গুরু হন জগৎপতি।
গুরুত্যাগীর মুখ দেখো না—দেখলে ধর্ম বিনশ্যতি।

বাউলদের অনেক গান আবার তাঁদের সাধন রহস্যকে ভিত্তি করে রচিত। সে সব গানে দ্ব্যর্থক জটিল তত্ত্ব থাকে। সে গানগুলি হেঁয়ালী ধাঁধার মত কথায় আবৃত। অনেক সময় বাউলেরা প্রশ্নোত্তর ছলে গানের মধ্যে দিয়ে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। ওদের সমাজে আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু জাতিভেদ নেই। অনেক মুসলমান বাউলও আছেন —তাদের বলা হয় ফকির বাউল।


বাউল

বাউল গান এক বিশিষ্ট ঢঙ ও গায়কী রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন বাউল গানে উচ্চ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীও মিশে থাকে। বাংলার বাউলেরা গান গায় মেলার জমায়েতে, আখড়ার উৎসবে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে। কখনো-বা গান গায় পথ চলতে চলতে।

বাংলার এই যে বিশিষ্ট ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি—এ কোনও একটি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচারিত হয়নি। কাজেই এই ধর্মমতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া খুব কষ্টকর। বাউলমতের যে পরিচয়টুকু আমরা পাই—তা ছড়িয়ে রয়েছে বাউল গানে ও কবিতায়। মুক্ত আকাশের নীচে একতারার ঝঙ্কারে মনের গভীর থেকে বাউলদের সঙ্গীত ধারা উৎসারিত হয়। নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রাণের উপলব্ধিকে তারা সহজভাবে পরিবেশন করেন। আত্মপ্রকাশের নেই তাদের কোন আগ্রহ। পুরনো পুঁথিপত্র ও শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশাসন তারা মানেন না। বাউলরা তাদের বিশ্বাস এবং আদর্শ অনুযায়ী কোন কিছু সংগ্রহ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাই অতীতে রচিত বাউল সঙ্গীতের সম্পূর্ণ সংগ্রহ মেলে না।

বাউল পুঁথি যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাদের মধ্যে ৺ক্ষিতিমোহন সেন অন্যতম। তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ

'প্রাচীনের জন্য বাউলদের কোনও আগ্রহ নেই। তাই প্রাচীন পুঁথিপত্র, বাউল-সঙ্গীত সংগ্রহে এঁদের উৎসাহ দেখা যায় না। বাউলেরা পুরনো সংগ্রহ পুঁথির চেয়ে নতুন জীবন্তকে বিশ্বাস করেন। তাই শাস্ত্রাদির সংগ্রহকেও তারা মান্য করেন না। এই কারণে বাউলদের রচিত বহু গান যথাযথ রক্ষিত হয়নি। বাউল সাহিত্যও গড়ে ওঠেনি।'

বাউল সঙ্গীত যাঁরা রচনা করেছেন তাদের মনে তথাকথিত শিক্ষার কোন প্রভাবই ছিল না। তারা সরল বিশ্বাসে ও সহজ বুদ্ধিতে যা সত্য বলে বুঝেছেন তাই দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাদের অনুভূতির মধ্যে যে গভীর ভাব, প্রকাশের যে সাবলীল ভঙ্গী তা আমাদের মুগ্ধ করে। তথাকথিত স্বল্প শিক্ষিত মানুষের পক্ষে জটিল তত্ত্বকে সহজভাবে প্রকাশের ক্ষমতা দেখে আমরা বিস্মিত হই।

বাউল ধর্মের সূচনা হয়েছিল অনেক আগে। কিন্তু পুরোপুরি একটি ধর্মমত হিসাবে এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। আধুনিককালে যে সব বাউলগান আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলি খুব প্রাচীন নয়। এদের অধিকাংশই রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে। ঊনবিংশ শতকে বাউল গান সংগ্রহের খুব চেষ্টা হয়েছিল। কয়েকজন প্রকাশক বাউল গানের সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহন সেনই প্রথম এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাউলদের সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তা জানার প্রেরণা পেয়েছি এঁদের কাছ থেকেই।

আমরা যে সব বাউল সাধকের গান সব চেয়ে বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করতে পেরেছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় লালন ফকিরের। এঁর গানের একটি সঙ্কলন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এঁর মৃত্যুর পর বাউল ফকিরদের মধ্যে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ফকির পাঞ্জুশাহ্। লালনের পরবর্তী কালে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন বাউল সাধক বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে গোপাল গোঁসাই এবং হাউড়ে গোঁসাই-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলার বাউল সম্প্রদায় আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি। পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরলে আজও অনেক সাধক-বাউলের সাক্ষাৎ মিলবে। পরনে শত তালিযুক্ত আলখাল্লা, মাথায় ধম্মিলা, দীর্ঘ কেশ চূড়াবেণী করে বাঁধা। ডান হাতে একতারা কিংবা দোতারা; কটিতে বাঁধা বাঁয়া, বাঁয়াতে ছন্দ তোলে—'ধাত্বি নাত্বি নাধিন ধিনা ধিন।' একতারাতে তোলে শব্দ ঝঙ্কার—'রংগুরু, রংগুরু, রংগুরু।' নিজেই বাজায়, নিজেই গায়, নিজেই নাচে।

বাংলার লোকসঙ্গীত

প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল অনেক রকম পালাপার্বণ ও আমোদ-উৎসব। বাংলার গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে বসত আসর, আঙ্গিনায় চলতো রামায়ণ পাঠ, চলতো কথকতা। প্রভাতী গান গেয়ে বৈষ্ণবেরা ঘুম ভাঙ্গাতো গ্রামবাসীদের। গাঁয়ের কবিরা গান বাঁধতেন। কতো রকমের গান! রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে গান। সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে গান। আধ্যাত্মিক ভাবে সমৃদ্ধ গান। দেশপ্রেমের গান। বিভিন্ন দেব-দেবীর স্তুতি গান। গায়কদের মুখে মুখে এ সব গান গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পড়ত ছড়িয়ে। এই সব গান বাংলার জনসাধারণের গান। এগুলিই বাংলার লোকসঙ্গীত—বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এইসব লোকসঙ্গীত যে শুধু শ্রান্তি দূর করে তা নয়, এগুলি শিক্ষার বাহনও বটে। কতো নীতিকথা, হিতকথা, ধর্মকথা—এই সব গানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বাংলার এই সব লোকসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে—সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের গান। বিভিন্ন ধরনের গায়কী রীতি। সুরের বৈচিত্র্যও কম নয়। বাউল গানের উদাস সুরে ফুটে ওঠে গ্রাম বাংলার ফাঁকা মাঠের শূন্যতার রূপ। চাষীদের গাওয়া ভাওয়াইয়া গানের সুর মাঠের হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। দাঁড় টেনে নৌকা বেয়ে চলে মাঝিরা। তাদের গাওয়া

ভাটিয়ালী গানের সুরে মন হয় উদাস। এ ছাড়াও আছে গাজন উৎসবের গান, নীলের গান, সারি, ঝুমুর ও খেমটা গান। আছে বোলান গান—ভাদু ও টুসু পরবের গান। আছে কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, মঙ্গল-চণ্ডীর গান, ধর্মমঙ্গলের গান, বিষহরির পালা গান। এ সবই বাংলার লোকসঙ্গীত। মনের ভাবের সঙ্গে সংযোগ রেখেই এগুলি রচিত। এগুলি পোষাকী সঙ্গীত নয়—বাঙ্গালীর অন্তর নিঃসৃত স্বতংস্ফূর্ত সঙ্গীত। সুর ও ভাবের অকৃত্রিমতায় এই সব সঙ্গীত সমৃদ্ধ।

বাংলার অধিকাংশ লোকসঙ্গীতেই ধর্মের ভাব, প্রথা ও লোকাচার প্রচ্ছন্ন আছে। কথ্য ভাষায় পদবিন্যাসই লোকসঙ্গীতের সাধারণ রীতি। প্রতিটি সঙ্গীতই সাহিত্যরস ও ভাব-গভীরতায় সমৃদ্ধ। আর সুরের কথা বলতে গেলে বলতে হয়—এ সব গানের সুর স্বতঃস্ফূর্ত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। সুরের মধ্যে থাকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব। তাল সহজ। আর গানের অস্থায়ী ও অন্তরা ভাবেই দেখা যায় গায়কী রীতির বৈশিষ্ট্য। কোন গান গাওয়া হয় টানা সুরে—কোন কোন গান আবৃত্তির অনুরূপ। কোন গান গীত হয় একক বা দ্বৈতকণ্ঠে—কোনটি-বা সমবেতকণ্ঠে। গান ভাবে অকৃত্রিম, সুরে স্বতঃস্ফূর্ত। সুরে মিশে থাকে বাংলার আকাশ-বাতাস, বন-প্রান্তরের উদাসভাব ও মর্মকথা।

লোকসঙ্গীতের ভাষাতেও দেখা যায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। গানের পদ-সংযোজনায় থাকে না কোন ব্যাকরণের অনুশাসন। এই সব গানের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বাজনা বাজানো হয়। বাজানো হয় একতারা, দোতারা, খঞ্জনী, সারেন্দা, গাবগুবী, ঢাক ও ঢোল। কখনও কখনও মৃদঙ্গও বাজানো হয়।

সুর বৈচিত্র্য নিয়ে বাংলার লোকসঙ্গীতে আছে নদীর গান, মাঠের গান, বিলের গান, ঘাটের গান, বাটের গান, আঙিনা ও অন্দরের গান, কবিগান। উৎসবে, ধর্মচিন্তায়, সুখে-দুঃখে, জন্ম-মৃত্যু থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনার ব্যাখ্যানও আছে। এই অধ্যায়ে বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করা হলো।

১। **বাউল গান**ঃ বাংলার লোকসঙ্গীতের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় বাউল গানের। 'বাংলার বাউল' অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তবুও এখানে বাউল গানের কথা না বললে এ অধ্যায় অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

বাউল গানের স্রষ্টা বাংলার বাউল সম্প্রদায়—যাঁদের নিজস্ব ধর্মমত আছে আছে নিজস্ব সাধনরীতি। বাউলের মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না—মানেন না জাতিভেদ। নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে ধর্মকথা, তত্ত্ব কথা ফুটিয়ে তোলেন। এ গান ভাব-সম্পদের গভীরতায় ও তত্ত্বে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকসঙ্গীতের চেয়ে মার্জিত ও উন্নত।

বাউল গানের তালে ছন্দ ও সুর আছে বিভিন্ন ধরনের। আছে বৈঠকী গান। পথ চলার সহায়ক গান। আছে দেহতত্ত্বের গান, মনের মানুষের গান, অনিত্যতার গান, গুরুবাদের গান। আর আছে বাউল সাধন-রহস্যের গান। কোন গানের ভাষা সহজ, কোনটি-বা দুর্বোধ্য শব্দ যোজনায় দ্ব্যর্থবোধক। এ সব গানের একটা নিজস্ব বিশিষ্ট ঢঙ ও গায়কী রীতি আছে। কিন্তু কোন কোন বাউল গানে উচ্চ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর মিশ্রণও দেখা যায়।

মনের মানুষের গান—বাউল ধর্মমতে দেহের মধ্যে আছে মনের মানুষ। মনের মানুষ দেহ-মন্দিরের অন্তরতম সত্তা। এই সত্তাকে বাউল সাধকেরা আত্মা বলে কল্পনা করেছেন। আর নাম দিয়েছেন অনেক—'মনের মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'রসের মানুষ' ইত্যাদি। নিজেকে যে চিনতে পারে না—মনের মানুষকে সে খুঁজে বেড়ায় বাইরে। নীচের গানটিতে এই ভাবটিই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ঃ

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে
বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আছে আলোকে বসে।
অচিন দেশে বসতি ঘর,
দ্বি-দল পদ্মে বারাম তার,
দল নিরূপণ হবে যাহার
ও সে দেখবি অনায়াসে।
আমার হলো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

গুরুকে আশ্রয় করে বাউলদের সাধনা। গুরু চাইই চাই। তাদের মতে গুরু আছেন তিন ধরনের ঃ (ক) শিক্ষাগুরু, (খ) দীক্ষাগুরু

এবং (গ) মূলগুরু। গুরুবাদের গানে গুরুসম্পর্কীয় তত্ত্ব আছে। যেমন ঃ

বল্ কোন্ গুরুর কর অন্বেষণ ?
শিক্ষা দীক্ষা গুরু দুইজন, কর্ণে করায় মন্ত্র শ্রবণ—
মনের গুরু কল্পতরু, মূলগুরু আছেন গোপন।
বল, কোন্ গুরুর কর অন্বেষণ।

২। নীল গাজনের গান ঃ বাংলা দেশে চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় গাজন উৎসব। এই উৎসবে গাওয়া হয় নীল গাজনের গান। 'নীল' হচ্ছে শিবের অন্য নাম। এই উৎসব উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা সদলবলে পথ বেয়ে চলেন। সঙ্গে থাকেন ত্রিশূল হাতে নিয়ে বাঘের ছালপরা শিব। আর থাকেন পার্বতী। প্রথমে হর-পার্বতীর নাচ হয়। তারপর শুরু হয় নীলের গান। এ গানের বিষয়-বস্তু হর-পার্বতীর পারিবারিক জীবনের ঘটনা। যেমন ঃ

নারদ মুনি ডাইক্যা বলে
শোন মামী, শোন, কই তোমারে
শাশুড়ীর বরণকালে, ঈশার মূল থাকবে ডালে
(মামী) তবেই বরণ করবে পঞ্চানন ॥
লয়ে ঈশার মূল বরণ ডালে
শাশুড়ী বরণ কালে
বরণ করতে লাগল তালে তালে,
ঈশার মূলের গন্ধ পেয়ে
শিব ছেড়ে সাপ, যায় পলায়ে
(শিবের) খসিয়া পড়ে, পরা বাঘের ছাল।

৩। বোলান গান ঃ শিবের গাজন উপলক্ষে বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় বোলান গান গাওয়া হয়। বোলান গান কিন্তু

অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত। বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে এবং নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা বোলান গানের জন্য প্রসিদ্ধ।

বোলান গান গাওয়া হয় শিবতলায়। গায়কেরা বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে আসেন। কেউ রাধা, কেউ-বা কৃষ্ণের সাজে আসেন। কেউ সাজেন রাম, কেউ লক্ষ্মণ। আবার কেউ-বা যুধিষ্ঠির, ভীম কি অর্জুন সাজেন। যাঁর যা পোষাক, তিনি সেই চরিত্রের অবতারণা করে গান ধরেন। নাচের বিরতিকালে চলে গান।

৪। **গম্ভীরা গান**ঃ দেবাদিদেব মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া হয় গম্ভীরা গান। বৈশাখ মাসে শিবস্থানে উৎসব হয়। সেই উৎসবে এ গান গাওয়া হয়। গম্ভীরা গানের জন্য প্রসিদ্ধ মালদহ জেলা। গম্ভীরা গানের শুরুতে থাকে শিববন্দনা। যেমন ঃ—

তুমি হলে চাষী, কাশীবাসী
হয়ে কাশীশ্বর
মন আত্মা-বলদ বেঁধে
কর্ম-জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া-রজ্জু নাসায় ছেদে
কতই না আর কর
তুমি টুমরা তালে, ডুমরা বাজাও
ঝুমরাতে কর পান।

গায়কেরা শিবস্তুতির পরই চলে যান অন্য প্রসঙ্গে। সাধারণত ব্যঙ্গাত্মক গানের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গায়কেরা সেজে-গুজে আসেন। তারপর ধরেন গান। গানের সঙ্গে নাচও চলে।

৫। **টুসু উৎসবের গান**ঃ 'টুসু' হলেন শস্যের দেবী। ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করেন তিনি। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে তাঁরই

ব্রত উদ্‌যাপন উৎসব শুরু হয়। উৎসব শেষ হয় মকর সংক্রান্তিতে। লোকাচারের ভিত্তিতে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। না আছে তার মন্ত্রতন্ত্র, না আছে পুরোহিত। আল্পনা আঁকা মাটির পাত্রে গোবরের গুটি রেখে মেয়েরা তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উপলক্ষে মেয়েরা গান ধরেন ঃ

আমরা যে টুসু থাপি
অঘ্রান সংক্রান্তিতে গো
তেল দিলাম, সলিতা দিলাম
স্বর্গে দিলাম বাতি গো।
তুষলী গো রাই, তুষলী গো মাই
তোমার পূজায় আমি কি বর পাই ?

টুসু ব্রত উপলক্ষে কখনও কখনও সারারাত ধরে গান চলে। গানের পদে অচেতন মনের কামনা-বাসনা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া গানের মধ্যে দিয়ে কখনও কখনও সমসাময়িক ঘটনা ও সামাজিক রীতিনীতিও প্রতিফলিত হয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় টুসু উৎসব খুব আড়ম্বর সহকারে পালিত হয়।

৬। **ভাদু উৎসবের গান ঃ** 'ভাদু' বাংলার এক বিশিষ্ট লোক উৎসব। বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় এই উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ভাদুর প্রতিমা তৈরি করা হয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় পয়লা ভাদ্র তারিখে। তারপর একমাস ধরে চলে ভাদু উৎসব। ঊনত্রিশে ভাদ্র রাত্রি জাগরণ ও গান। পরের দিন ভাদুর বিসর্জন।

ভাদু উৎসবে দেবীকে উদ্দেশ্য করে আগমনী গান গাওয়া হয়। গাওয়া হয় ভাদুর বিয়ে ও বাসরের গান। তাছাড়া রঙ্গ-তামাশার গান, বিদ্রূপাত্মক গান, এমন কি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গানও চলে। মোট কথা গানই ভাদু উৎসবের প্রাণ। এ সব গান রচিত হয়

মুখে মুখে। গানে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী ও সদ্য বিবাহিত মেয়েরা। ভাদুর গান এই রকম ঃ

আমার ভাদুর পরবের হাট লাগল রে।
কেউ পরেছে নাকে ঢেঁড়ি; কেউ বা পায়ে মল,
ফরফরিয়ে বলে তারা ভাদু দেখতে চল ॥
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, পেঁপাটি বাজে ভারি,
ট্যাং ট্যাঙা কাঁসাই বাজে ঐটি সইতে নারি।

৭। ঢপ গান ঃ ঢপ গান উত্তর-প্রত্যুত্তর বা বাদানুবাদের গান। পল্লী আসর জমে ওঠে ঢপ গানে। গানের শুরুতে সভাবন্দনা করা হয়। আসল গান হয় তার পরে। এক পক্ষ রাধা বা পার্বতী ভাবে ভাবিত হয়ে প্রশ্ন করে গায়, অপর পক্ষ কৃষ্ণ া শিব ভাবে ভাবিত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন ঃ

বংশী বাজায় কেরে সখি, তারে আইন্যা দে
ছিদ্র গোটা ছয়, বাঁশি কত কথাই কয়
আমার মন যে চলে সুরে, টানে ঘরে নাহি রয়।

ঢপগানের বৈশিষ্ট্য সহজ ভাষা, সহজ সুর এবং সুন্দর পরিবেশন ভঙ্গী।

৮। ভাটিয়ালী গান ঃ ভাটিয়ালী গান মূলত নদীবহুল বাংলার গান—পূর্ববঙ্গের গান। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গেও এ গানের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কম নয়। এ গানের সুরে আছে বৈশিষ্ট্য—আছে জল-কম্পনের রেশ।

নদীপথে অন্ধকার নেমেছে। দূর থেকে কানে ভেসে এলো কান্নার সুর। আসলে তা কান্না নয়—ভাটিয়ালী গানের প্রথম কলির সুরের দীর্ঘ রেশ। গাইছে নৌকার এক মাঝি। স্বরে কম্পনের রেশ। নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে সে রেশ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সুর তালহীন কিন্তু গতি তার স্বচ্ছন্দ। মাঝি নৌকায় পাল তুলে দিয়ে বৈঠা ধরে কর্মহীন নিঃসঙ্গ অবসরে ভাটিয়ালী গান গাইছে। গাইছে ঃ

দাও

খুইলা দাও মন্দিরার কেওয়ার

লাগুক শীতল হাওয়া রে।

রাই তুই যারে যা পোহাইয়ে॥

৯। **কীর্তন গান ঃ** বাংলার কীর্তন গানের ভারত জোড়া প্রসিদ্ধ। কীর্তন গানের আছে একটা নিজস্ব ঢং। সুর ও ছন্দের বৈচিত্র্য আছে আর আছে ভাব-গভীরতা। কীর্তন গানকে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) পদাবলী কীর্তন ও (খ) নাম কীর্তন। পদাবলী কীর্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা। বিভিন্ন রস—যেমন দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস প্রভৃতিতে এ কীর্তন পুষ্ট। তাই একে রসকীর্তনও বলা হয়। এ কীর্তনের বর্ণনা ধারাবাহিক। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে বাংলা দেশে কীর্তন গানের ব্যাপক প্রচলন হয়। একটি কীর্তন গানের নমুনা ঃ

ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব

তুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাব।

টানিয়া বান্ধিব চূড়া, তাহে নব গুঞ্জ বেড়া

নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীত বসন অঙ্গে পরাইব শ্রীগোবিন্দে

বদনে তাম্বুল দিব আর।

১০। **কবিগান ঃ** কীর্তন গানের মত কবিগান ও বাংলার নিজস্ব গান—নিজস্ব সম্পদ্। এ গানে পৌরাণিক বিষয় নিয়ে অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে পদাকারে রচিত গান গাওয়া হয়। গাওয়া হয় বিলম্বিত লয়ে। এ গান প্রাচীন রাগ-সঙ্গীতপুষ্ট।

গান গাওয়ার পর একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রশ্ন ও উত্তরের অবতারণা করা হয়। এরই নাম 'চাপান' ও 'কাটান'। একপক্ষ কতিপয় প্রশ্ন করেন, অপরপক্ষ সে প্রশ্নের জবাব দেন কবিতায়। এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় কবিয়ালদের সহজাত কবিত্বশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির। প্রশ্ন করা হয় সাধারণত দেবলীলার বিবিধ তত্ত্বের উপর। কাজেই কবিয়ালদের যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান ও পৌরাণিক কাহিনীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রত্যেক দলে থাকেন একজন সরকার বা পদকর্তা। তাছাড়া থাকেন মূল গায়েন, দোহারী, ঢোল-কাঁসি ও বেহালা বাদক।

বাংলার খ্যাতনামা কবিয়ালদের মধ্যে অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি, গুজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা ও নবাই ঠাকুরের মাম উল্লেখযোগ্য।

১১। রামায়ণ গান: রামায়ণ-গান—পালা গান। আজও বাংলার পল্লীতে রামায়ণ গান খুবই জনপ্রিয়। আসর বসে সন্ধ্যার পরে। মধ্যরাত্রি অবধি গান চলে। রামের জন্মকাল হতে বিবাহকাল অবধি সময়ের বিভিন্ন আখ্যায়িকা রামায়ণ গানের উপজীব্য বিষয়।

১২। **শ্যামা-সঙ্গীত:** শ্যামা-সঙ্গীত, কালী বিষয়ক সঙ্গীত। এ সঙ্গীত কালী কীর্তন হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধক কবি রামপ্রসাদ বাংলার শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গানের বিশেষ ঢংটিকে বলা হয় 'রামপ্রসাদী ঢং'। তাঁর সব কটি গানই সুগভীর ভাবমূলক—ভক্তিমূলক। রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত শ্যামা-সঙ্গীত:

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥

১৩। **স্বদেশী সঙ্গীতঃ** ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন ভারতের অনেক কবি-গায়ক। এইসব কবি-গায়কদের মধ্যে বাংলার মুকুন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের গানের জ্বালাময়ী ভাষা ও সুরের মাধুর্য দেশবাসীকে যুগে যুগে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। দেশের প্রথা, আচার, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চেতনা জাগিয়েছে। বাংলার লোকসঙ্গীতে এই সব স্বদেশী সঙ্গীতের দান অপরিসীম।

এখানে কবি মুকুন্দ দাসের একটি স্বদেশী সঙ্গীত উল্লেখ করা হলো ঃ

আয় রে বাঙালী, আয় সেজে আয়
আয় লেগে যাই দেশের কাজে।
জগৎ জানুক ভীতু বাঙালী
দাঁড়াতে জানে ধরা-সমাজে ॥
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ
ওরে বাঙালী সাজ তোরা সাজ।
এখনও নীরব, নাহি কি রে লাজ
ডুবলি যে ভরা মরণ সাগরে ॥
বীর কখনও কি নত করে শির
ধার ধারে কি সে 'হা হতোহস্মি'র
পারে কি দেখিতে বীর জননীর
উলঙ্গ মূরতি যুগ-যুগান্তর ধরে।

বাংলার লোকনৃত্য

সৃষ্টির শুরু থেকে আদিম মানুষ নেচে আসছে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। তাদের সে নাচ ছিল খুশি হবার জন্য এবং দেবতা-অপদেবতাদের খুশি করবার জন্য। আদিম মানুষের নাচ ছিল প্রধানত দলবদ্ধ নাচ। শিকারে যাবার আগে শিকারীদের উন্মাদনা জাগাতে তারা নাচত, নাচত ধর্মীয় উৎসবে। তখন নাচ ছিল সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার অন্যতম উপায়।

ক্রমে মানুষ উন্নত হল। উন্নত হল তার জীবনযাপন প্রণালী। চাষবাস শিখল মানুষ। শিখল ঘর বাধতে। সঙ্গে সঙ্গে তার আদিম নৃত্যের আঙ্গিকও মার্জিত হলো। অঞ্চল ও রুচিভেদে নাচের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলো। আর তারই ফলে উদ্ভব ঘটল লোকনৃত্যের। লোকনৃত্য হচ্ছে লোকধর্মী নাচ। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আবেগের নাচ। সাধারণত উৎসব ও ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে নাচ।

বাংলার লোকনৃত্যের মধ্যে—'গাজন', 'বাউল', 'রায়বেঁশে' ও 'ঢালি নৃত্য' অন্যতম। এইসব লোকনৃত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর স্বকীয়তা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ প্রকট হয়ে ওঠে। আবার সাঁওতালদের 'সোহরায়', ওঁরাওদের 'কারাম', শেরপাদের 'বিয়াছম', লেপচাদের 'ধান' ও নেপালীদের 'ডাম্ফু' প্রভৃতি লোক-নৃত্যের মধ্যে বাংলার প্রান্তিক ও পার্বত্যজাতিদের প্রথা ও বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে।

বাংলার লোকনৃত্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ (ক) ধর্মীয় আচরণযুক্ত নাচ—এসব নাচ বছরের বিশেষ বিশেষ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন—গাজন নাচ, কালীকাচ নাচ, শবখেলা প্রভৃতি। (খ) সামাজিক উৎসবে অনুষ্ঠিত নাচ। যেমন—বহুরূপী নাচ, কাঠি নাচ, লেটো নাচ প্রভৃতি। (গ) শক্তিচর্চা ও রণ নাচ যেমন রায়বেঁশে নাচ, শেরপাদের বিয়াছম নাচ প্রভৃতি। এইসব নাচের মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে সহজ, সাবলীল ও সমবেত গোষ্ঠী নাচ আর কতকগুলিতে আছে জটিল তাল, লয় ও ছন্দ। সেগুলি হস্তকর্মে পুষ্ট নাট্যধর্মী নাচ।

এই অধ্যায়ে বাংলার কয়েকটি বিখ্যাত লোকনৃত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

১। **বাউল নাচ** ঃ—বাউলদের দেবতা নেই। তারা তীর্থ, প্রতিমা, শাস্ত্রীয় বিধি—কিছুই মানে না, মন্ত্র উচ্চারণও করে না। মন্ত্রের বদলে তারা গায় গান আর নাচে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাদের পরনে শত তালিযুক্ত আলখাল্লা, মাথায় ধম্মিলা, দীর্ঘকেশ, চূড়া বেণী করে বাঁধা। তাদের ডান হাতে কারো একতারা কারো দোতারা। তাদের কটিতে বাঁধা বাঁয়া। বাঁয়াতে তারা ছন্দ তোলে— 'ধাত্বি-নাত্বি-নাধিন-ধিনা-ধিন'। আর ডান হাতের একতারাতে তোলে শব্দ-ঝঙ্কার—'রং গুরু, রং গুরু, রং গুরু'। তারা নিজেই বাজায়, নিজেই গায়, নিজেই নাচে।



বাউল নাচ

বাউলদের নাচের দুটি ভাগ আছে—নৃত্ত ও নৃত্য। নৃত্তের অঙ্গকর্ম হয় শুদ্ধ আঙ্গিকে। কিন্তু এই অঙ্গকর্ম ব্যঞ্জনাবিহীন। অপর পক্ষে নৃত্যের অঙ্গকর্ম ব্যঞ্জনাত্মক। নৃত্যে আঙ্গিক হচ্ছে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে গানের কথার অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। বাউলরা গানের বিরতিতে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একতারা বা দোতারা বাজিয়ে নৃত্ত করে। আর ওদের নৃত্যভঙ্গী নির্ভর করে যন্ত্রের গঠন ও বাজাবার পদ্ধতির উপর। নাচের সময় ওরা নানা রকম অক্ষিকর্ম ব্যবহার করে। কখন অর্ধবিকশিত বা নিমীলিত অক্ষিকর্ম আবার কখনও-বা আলোকিত বা প্রলোকিত অক্ষিকর্ম। বাউলদের নাচের কোন বাঁধাধরা ছক নেই। মনে যখন যে ভাব ও রসের উদয় হয়—তারই ব্যঞ্জনা দেয় তারা নাচে। তাদের নাচ স্বতঃস্ফূর্ত।

২। বোলান গাজনের নাচ ঃ গাজনের দেবতা শিব। বোলান গান গাওয়া হয় গাজন উৎসব উপলক্ষে। কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষে রচিত অধিকাংশ গানই রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে। বোলান নাচ চলে বোলান গানের সঙ্গে। যারা নাচে তারা পালকের শিরোভূষণ পরে। হাতে লাঠি ও বর্শা নেয়। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ঢাক, ঢোল, মাদল সহকারে সাঁওতালদের অনুরূপ তারা নাচে। নাচের বিষয় ও রীতি তান্ত্রিক নিষাদ আচারযুক্ত।

বোলান গাজনে পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বন করে নাচার রীতিও আছে। কেউ নাচে ভীম বা অর্জুন বেশে। মুখোশের অনুরূপ করে তারা মুখ চিত্রিত করে নেয়।

'গৃধিনী বিশাল নৃত্য' ও 'শ্মশান জাগানো নৃত্য'ও হচ্ছে বোলান গাজনের নৃত্য। শ্মশান জাগানো নৃত্যে শ্মশানের পরিবেশ অভিনীত হয়। আর গৃধিনী বিশাল নৃত্যে গৃধিনীদের গলিত শব-মাংস

খাওয়ার অভিনয় দেখানো হয় নৃত্যছন্দে। এই দুই নৃত্য উদ্দাম গতিযুক্ত।

মালদহ জেলাই বোলান গাজন নাচের জন্য প্রসিদ্ধ।

৩। **মুখোশ নাচ**ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুখোশ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলায়ও নানা রকম মুখোশ নৃত্যের প্রচলন আছে। মুখোশের গঠন পদ্ধতি এবং নৃত্যরীতি বাংলার সব জায়গায় এক রকম নয়। কোথাও মুখোশ নৃত্য আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ, আবার কোথাও-বা ধর্মাচরণের অঙ্গ। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ারদের যে মুখোশ নৃত্যের চলন আছে—তা নিছক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ। আবার গাজনের কালীকাচ নৃত্য, গম্ভীরার কালীনৃত্য বা বিষ্ণুপুরের রাবণকাটা নৃত্য ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ।



কালীকাচ নৃত্য

বাংলার প্রান্তিক পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও মুখোশ নৃত্যের প্রচলন আছে। যেমন নেপালীদের মহাকালী লাখে, কাশিয়াং ও কালিম্পং অঞ্চলের তিব্বতীয়দের সিঙ্গীছম ও ছমরীছম নৃত্য।

যে বেতের ছড়ি দিয়ে ঢাক বাজানো হয় তাকে বলা হয় 'কাচ'। কাচ দ্বারা আহত বিভিন্ন ছন্দের তালের সঙ্গে যে কালী নাচ হয়—তারই নাম কালীকাচ নৃত্য। কোথাও চামুণ্ডাকালীর নৃত্য হয়, আবার কোথাও বা শ্মশান কালীর নৃত্য হয়। নাচের আগে মুখোশটি শাবরী মন্ত্রে শুদ্ধ

করে নেওয়া হয়। সেই মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হয় নর্তকের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে দেবী ভর করেন নর্তকের উপর। নর্তকের ভাবাবেশ প্রকাশ পেলেই 'গিজাঘিন-গিজাঘিন-গিজাঘিন' রবে ঢাক বেজে ওঠে। এক হাতে অসি এবং অন্য হাতে নরমুণ্ড নিয়ে ঢাকের তালে তালে নর্তক নাচতে থাকেন। এ নাচ বীর ও বীভৎস রসপ্রধান।

বিষ্ণুপুরের রাবণকাটা নৃত্যও বাংলার এক বিখ্যাত মুখোশ নৃত্য। বারো ফুট উঁচু করে মাটির রাবণ-দেহ তৈরি করা হয়। কাঠের তৈরি রাবণের দশমুণ্ড তাতে যুক্ত করা হয়। উৎসব উপলক্ষে চলে নৃত্য। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে হনুমান, বিভীষণ ও সুগ্রীব। নর্তকদের পরনে থাকে শনপাটের তৈরি জামা আর মুখে কাঠের মুখোশ। উৎসব শেষে শ্রীরামচন্দ্রের হাতের অসি দ্বারা হনুমান রাবণকে দ্বিখণ্ডিত করে।



মুখোস নৃত্য

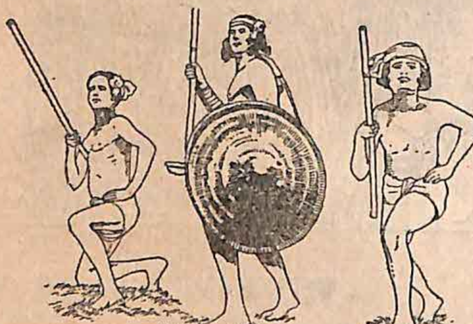
৪। ছৌ নাচঃ বাংলা দেশে ছৌ নাচের প্রচলন হয়েছে একশো বছরেরও আগে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ছৌ নাচের কয়েকটি কেন্দ্র দেখা যায়। বছরের যে কোন পালা-পার্বণ উপলক্ষেই ছৌ নাচ হতে পারে। তবে সাধারণত গাজন উৎসব উপলক্ষে বৈশাখ মাসে ছৌ নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ছৌ নাচের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঘাড় ও হাত সঞ্চালনের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায়। এ নাচের গতি ও ভঙ্গিতেও আছে বলিষ্ঠতা।

নর্তকেরা নানা রকম মুখোশ পরে। পরে নানা রকম অলঙ্কার। কখনও সাজে শিব-পার্বতী, আবার কখনও-বা দৈত্য-দানব। তারপর ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে নাচে।

৫। ঢালি নাচঃ ঢালি নাচ বাংলার রণনৃত্যের অঙ্গীভূত। এ নাচ বীর রসাত্মক। নাচের আক্রমণ ও প্রতিরোধাত্মক ভঙ্গিমা উদ্ধত। নাচের পদচারণা উন্মাদনাপূর্ণ। প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নর্তকের হাতে থাকে ঢাল—কাঠ, বেত বা চামড়ার তৈরি ঢাল। ঢাল থাকে বাঁ হাতে, ডান হাতে থাকে বর্শা।

ঢালি নৃত্য ত্রয়ী-নৃত্য অর্থাৎ তিনজনে মিলে নাচা হয়। কখনও বা দুই দলে বিভক্ত হয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় হয়। নৃত্যের ভঙ্গি যখন আক্রমণাত্মক হয়, তখন নর্তক সজাগ ও সন্ধান দৃষ্টি নিয়ে সাপের মত ধীরে ধীরে এগোয়। এগোয় সড়কি নিক্ষেপের ভঙ্গি প্রয়োগ করে। নর্তকের পরনে মালকোঁচা হাঁটু পর্যন্ত তোলা। মাথায় ফেট্টি, হাতের মণিবন্ধে কাপড় জড়ানো। হাতে বর্শা ও ঢাল তো আছেই।



ঢালি নাচ

৬। রায়বেঁশেঃ বীরভূম জেলার তাঁতিপাড়া ও চারকল গ্রাম এককালে দুর্ধর্ষ লেঠেল রায়বেঁশে সম্প্রদায়ের পীঠস্থান ছিল। সেকালে প্রত্যেক জমিদারের আশ্রিত রায়বেঁশে গোষ্ঠী থাকতো। উৎসবের দিনে তারা শক্তির খেলা দেখিয়ে গ্রাম মাতিয়ে তুলতো।

ভঙ্গির বলিষ্ঠতায়, গতির উদ্দমতায় রায়বেঁশে নৃত্য অপূর্ব।

শুরুতে হুঙ্কার দিলে নৃত্য আরম্ভ করা হয়। নৃত্যের আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢাক-ঢোলের ব্যবহার দেখা যায়। আজকাল আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ হিসাবে রায়বেঁশে নৃত্য পরিবেশিত হয়।

৭। **ঝুমুর নাচ**ঃ বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে ঝুমুর নৃত্যের প্রচলন বেশী দেখা যায়।

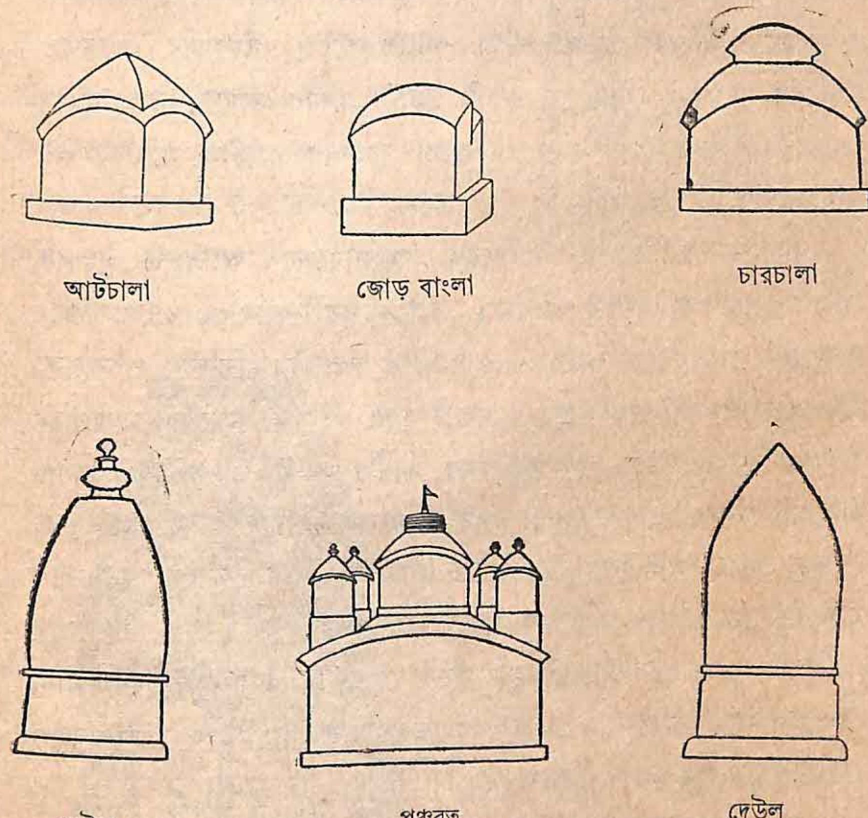
ঝুমুর গানের সঙ্গে চলে ঝুমুর নৃত্য। বিষয়-বস্তুর সঙ্গে কিন্তু নৃত্য-আঙ্গিকের কোন যোগ নেই। নৃত্যভঙ্গি ও পাদচালনা স্বতঃস্ফূর্ত। নৃত্যরীতি অনেকটা সাঁওতালী নৃত্যের অনুরূপ। নর্তক এগোয়, পেছোয়, পাশে যায় ও মণ্ডল করে। সাধারণ বেশেই থাকে নর্তকেরা, তবে এ নাচ গোষ্ঠীবদ্ধ নাচ। নাচের সঙ্গে আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র হিসাবে থাকে বাঁশি ও মাদল।

ধর্মের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলা। বাংলার বিস্তৃত সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি বিস্তার করলে চোখে পড়ে বিচিত্র গঠনের ছোট বড় অনেক মন্দির। এই সব মন্দির দেখলে মনে হয় বাঙ্গালীরা বুঝি যুগে যুগে মন্দিরের অলঙ্কার সাজিয়ে গেছে তাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলা দেশকে।

ধর্মীয় সৌধ নির্মাণে পৃথিবীর সব দেশেরই কিছু না কিছু কৃতিত্ব আছে। মন্দির নির্মাণে বাঙ্গালীরও কৃতিত্ব আছে। বাংলার মন্দিরগুলি দীর্ঘকাল ধরে বাঙ্গালী শিল্পীর শিল্পানুভূতি সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে আসছে। এই সব মন্দিরগুলি বাঙ্গালীর আন্তরহৃদয়ের পরিচয় দেয়। পরিচয় দেয় আনন্দ-বেদনার ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির। বাংলার মন্দির-শিল্প, মন্দির-স্থাপত্য বাঙ্গালীর নিজ বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। এই দেব-দেউলগুলি বাঙ্গালীর জাতীয় তীর্থ।

ছাদের আকৃতি অনুসারে বাংলার মন্দিরগুলিকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উপর্যুপরি কতকগুলি সমান্তরাল চতুষ্কোণ স্তরের সমষ্টি। স্তরগুলি যত উপরে উঠতে থাকে ততই আকারে ছোট হয়। উড়িয্যার এই রকম ছাদযুক্ত মন্দির 'ভদ্র-দেউল' অথবা 'নীড়-দেউল' নামে অভিহিত হয়। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উড়িয্যার মন্দিরের মত শিখরে ঢাকা। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরের গা থেকে উঁচু শিখরের চারটি ধার উঠে যায় এবং অল্প অল্প করে বাঁকতে বাঁকতে অবশেষে প্রায়

সংলগ্ন হয়ে যায়। এই সংযোগস্থল একটি গোলাকার পাথরখণ্ডে আবদ্ধ করা হয়। ঐ গোলাকার পাথরখণ্ডকে বলা হয় 'আমলক শিলা'। শিখরের গায়ে কারুকার্য করা অনেক লম্বালম্বি পঙ্‌ক্তি থাকে। এই শ্রেণীর মন্দিরের নাম 'রেখ-দেউল'। (গ) ভদ্র-দেউল



বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির

বা নীড়-দেউলের সর্বোচ্চ স্তরের উপর একটি স্তূপ বা শিখর স্থাপন করে তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির সৃষ্টি করা হয়। (ঘ) আবার, ভদ্র বা নীড়

দেউলের সর্বোচ্চ স্তরের উপর তো বটেই, উপরন্তু প্রতি স্তরের কোণে এবং সামনে স্তূপ বা শিখর স্থাপন করে চতুর্থ শ্রেণীর মন্দির গড়া হয়।

এখানে যে চার শ্রেণীর মন্দিরের কথা বলা হলো তার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির বাংলায় বর্তমানে দুর্লভ। দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের মন্দিরটি চতুর্থ শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে একটি ছোট মন্দির আছে, সেটি প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের নিদর্শন। এ ছাড়া বাংলার প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

বাংলার প্রাচীনতম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের পাহাড়পুর গ্রামে। পাহাড়পুর বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানকার সুপ্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পালসম্রাট ধর্মপাল। একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ চত্বরের মাঝখানে প্রায় আশি ফুট উচু এক ইষ্টকময় মাটির স্তূপ খুঁড়ে এই প্রকাণ্ড মন্দিরটি বের করা হয়েছিল। এই মন্দিরের চারিদিকে যে সমচতুর্ভুজ বেষ্টনী আছে সেই বেষ্টনীর প্রতিটি দিক ৮২২ ফুট দীর্ঘ। পাহাড়পুর মন্দিরটি ত্রিতল। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি চতুষ্কোণ বর্গাকৃতি অংশ সোজা উপরে উঠে গেছে। তার চারিদিকে মোটা দেওয়ালযুক্ত প্রাচীর। প্রাচীরের ভেতরকার জায়গাটুকু ফাঁকা হলেও সেখানে ঢুকবার কোন উপায় নেই।

পাহাড়পুরের মন্দির ইঁট ও কাদার গাঁথনীতে গড়া। অথচ হাজার বছর পরে আজও মন্দিরের ইঁটের দেওয়ালের ৭০ ফুট অবশিষ্ট আছে। সেইটাই আশ্চর্যের বিষয়। মন্দিরের উপরটা বর্তমানে নেই। কেমন ছিল—তা জানাবারও কোন উপায় নেই। মন্দিরের

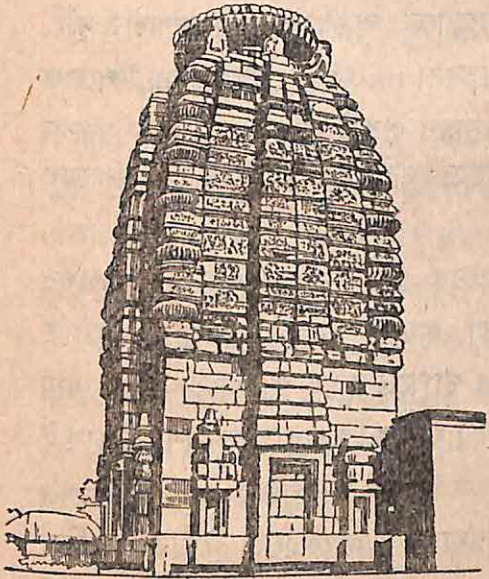
দেওয়ালে মাঝে মাঝে কারুকার্য করা ইঁটের কার্নিশ এবং দেওয়ালের গায়ে তিনটি সারিতে সাজানো পোড়ামাটি ও প্রস্তর ভাস্কর্যের ফলক আজও রয়েছে।



কেশীবধ (পাহাড়পুর)

পাহাড়পুরে পাওয়া কতকগুলি মুদ্রার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে সেযুগে এখানে 'সোমপুর বিহার' নামে একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। আর মন্দিরটি ছিল সেই বিহারের কেন্দ্রসত্তা।

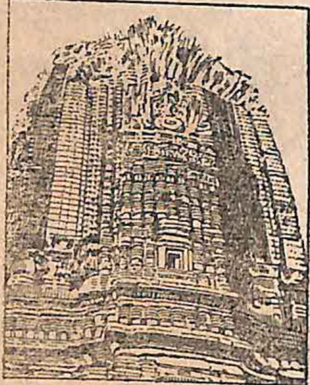
বাংলায় প্রাক্ মুসলিম যুগের কয়েকটি মন্দির আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। এই সব মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো বরাকরের মন্দির। বরাকর বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। এখানকার মন্দিরের সঙ্গে উড়িষ্যার রেখরীতির নাগর মন্দিরের যথেষ্ট মিল আছে। বরাকরের মন্দিরের ভিত্তিনক্সা চতুষ্কোণ। প্রাচীর বেশ মোটা। ভেতরের গর্ভগৃহ সমচতুষ্কোণ।



বরাকরের মন্দির

প্রবেশপথ মাত্র একটি। মন্দিরের ভেতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। মন্দিরের তলদেশ থেকে শীর্ষভাগ পর্যন্ত অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। সেই তিনটি ভাগের নাম বাড়, গণ্ডী ও মস্তক।

বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির রেখ-দেউলের এক সুন্দর নিদর্শন। এটি খাড়া রেখায় অলঙ্কৃত চূড়া বিশিষ্ট দেউল। এক সময় মন্দিরের চূড়াটি বেশ উঁচু ছিল। এখন চূড়ার কিছু অংশ গেছে ধ্বসে। ইঁটে গড়া এই রেখমন্দিরটি খুবই সুন্দর। মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ ছাড়াও অন্য তিনদিকে তিনটি ক্ষুদ্র মন্দিরাকৃতি কুলুঙ্গী আছে। এই সব কুলুঙ্গীতে অতীতে পার্শ্ব দেবতার মূর্তি থাকতো। এই কুলুঙ্গী বরাবর উপরেও অনুরূপ একটি কুলুঙ্গী আছে। একে বেষ্টন করে আছে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের অনুকৃতি। মন্দিরের অলঙ্কার এক কথায় অনবদ্য।


বহুলাড়ার মন্দির (বাঁকুড়া)

বাংলার সর্বত্রই নানা আকারের ও নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চালাঘর আকৃতির মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দির স্থাপত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা মেলে না। বিষ্ণুপুরের মন্দির-শিল্পের পরিবেশ নিতান্তই ঘরোয়া। এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশ। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে চালাঘরের অনুকরণে তৈরি বিভিন্ন আকৃতির প্রকার ভেদ দেখা যায়। পাশাপাশি লাগানো দুখানি দোচালা ঘরের আকারে গড়া মন্দিরকে বলা হয় 'জোড়বাংলা

মন্দির'। বিষ্ণুপুরে এমন একটি সুন্দর জোড়বাংলা মন্দির আছে। সেটি ইঁটে গড়া এবং ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের গায়ে সোজা এবং শোয়ানো রেখার অলঙ্কার দেখা যায়। দেখা যায় কেকরীকাটা খিলান দেওয়া আর পোড়ামাটির ফলক।

সেকালের বাংলার অবস্থাপন্ন অধিবাসীরা দোচালা অপেক্ষা চারচালা ঘরই বেশী পছন্দ করতেন। আজও অবশ্য তাই। যত বেশী চালযুক্ত ঘর হতো ততই গৃহস্থের আভিজাত্য প্রকাশ পেতো। তাই অনেকে আবার আটচালা ঘরও তৈরি করতেন। বাংলা দেশে এই চারচালা ও আটচালা ঘরের অনুকরণে চারচালা ও আটচালা মন্দিরও তৈরি হয়েছিল। বিষ্ণুপুরে চারচালা মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। অনেক চারচালা মন্দিরের উপরে চূড়া স্থাপন করা আছে। বিষ্ণুপুরের লালজীর মন্দির, মদনমোহনের মন্দির ও কালাচাঁদের মন্দির একচূড়া বিশিষ্ট চারচালা মন্দির। যে মন্দিরের চারটি চাল ও পাঁচটি চূড়া থাকে—তাকে বলা হয় 'পঞ্চরত্ন মন্দির'। বাংলার অনেক জায়গাতেই সুন্দর গড়নের এই পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বগড়ী রোড স্টেশনের অদূরে বগড়ী-কৃষ্ণনগর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানকার কৃষ্ণরায়জীর মন্দিরটি পঞ্চরত্ন মন্দির। বিষ্ণুপুরের মদনগোপালের মন্দিরটিও পঞ্চরত্ন মন্দির।

সেকালের বাঙ্গালীরা এমনিভাবে চাল ও চূড়ার সংখ্যা বাড়িয়ে মন্দিরকে আড়ম্বরপূর্ণ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবার প্রয়াস পেতেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এই চালাঘর রীতি কিভাবে এবং কেন প্রবর্তিত হলো ?

—মুসলমান নবাব ও সুলতানদের আমলে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তে পড়ে বাংলার বাহ্য আড়ম্বর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে বসেছিল। বাংলা

তার সমস্ত সম্পদ্ গৃহকুটিরে এনে লুকিয়ে ছিল। বাংলার পাণ্ডিত্য ঠাঁই নিয়েছিল পণ্ডিতদের জীর্ণ গৃহের আশ্রয়ে, ছোট ছোট টোলে। ধর্ম তার সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর বর্জন করে একান্ত অন্তরঙ্গ ও গৃহগত হয়ে বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিল। অবলম্বন করেছিল তুলসীমঞ্চ ও বাসগৃহ। তাই তখন আমরা দেখি বাংলার প্রতি বৃক্ষতলই মন্দির—প্রতি গৃহই দেবস্থান।

তারপর কেটে গেল সেই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তা। বাংলা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বাংলার স্থপতিরা আবার মন্দির নির্মাণে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নাগর রীতির মন্দিরের সঙ্গে বাঙ্গালীস্থপতির যোগসূত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বড় বড় পৃষ্ঠপোষকেরাও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন। পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষই তখন মন্দির গড়ার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠলেন। মন্দির শিল্পে তাই আমরা তখন দেখি আড়ম্বরপূর্ণ নাগর রীতির পরিবর্তে পল্লীর স্বল্প সম্বল সভ্যতার ছাপ। ইতিমধ্যে বাঙ্গালী ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ দেব-দেবীকে ত্যাগ করেছে। আপন করে নিয়েছে গোপালকে, বংশীধারী শ্যামরায়কে আর সর্বংসহ মহাদেবকে। এই সব উপাস্য দেবতারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে চালাঘরেই ঠাঁই নিয়েছিলেন। মন্দির তখন খড়ের চালাঘর। তাই বাংলার স্থপতিরা এই চালাঘরকে নিয়েই তাঁদের নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত করলেন—তাঁদের হাতে চালাঘর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে মন্দিরে বিবর্তিত হলো।

মন্দিরের উপর চূড়াস্থাপন একটি সুপ্রাচীন রীতি। বঙ্গ-দেশেও এই রীতির নিদর্শন অতি প্রাচীনকালেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চালাঘরের আদর্শে মন্দির নির্মাণ—বাংলার সম্পূর্ণ নিজস্ব স্থাপত্যশৈলী। বাংলার স্থপতিরা ক্রমে এই চালাঘরের আদলের সঙ্গে

প্রাচীন শিখরচূড়া সংযোজন করে এক নতুন ও অতি সুন্দর মন্দির রীতি প্রবর্তন করে গেছেন। শুচিতা ও সৌন্দর্যের আধার এই মধ্য-যুগীয় মন্দিরগুলি বাংলার মন্দির শিল্পের এক অনবদ্য কৃতিত্ব।

প্রাচীন ভারতের গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে (৩২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ইঁট ও পাথর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণ দিয়ে মন্দির নির্মাণ রীতি প্রবর্তিত হয়। গোড়াতে এই সব মন্দিরগুলি ছিল ছোট। মন্দিরের গায়ে কারুকার্যও থাকতো না। পরে মন্দিরের আয়তন বাড়তে থাকে এবং তার গায়ে নানা অলঙ্করণও হতে থাকে।

বাংলা—পলিমাটির দেশ। পলিমাটি দিয়ে ইঁট তৈরি হয় ভাল। তাই বাংলার মন্দির শিল্পে বরাবরই ইঁট বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই বলে বাংলার সব প্রাচীন মন্দিরই যে ইঁটে গড়া —তা নয়। কিছুসংখ্যক পাথরে গড়া মন্দির আছে। তবে সেগুলি সংখ্যায় নিতান্ত কম। মন্দির নির্মাণের উপযোগী পাথর এখানে কম। তবুও শুরুতে পাথর ব্যবহার করে নাগর রীতিতে মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তবে সে পাথরের ব্যবহার এদেশে উড়িষ্যার মত অত ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলার মন্দিরগুলি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা দক্ষিণের মন্দিরের মত উত্তুঙ্গ ও বৃহদায়তন নয় বটে, তবে বিশিষ্টতা—সুগঠিত অবয়বে এবং নক্সার বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময়।

বাংলার উৎসব

বাংলা দেশে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' লেগেই আছে। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে পার্বণ বা উৎসবহীন দিনের সংখ্যা বছরে খুবই কম। এই উৎসব ও পার্বণগুলি বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। স্থানভেদে ও কালভেদে বাংলায় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত উৎসব পার্বণ দেখা যায় নানা বৈচিত্র্যে। আর এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত আছে গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস রচনার কিছু উপকরণ। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা ও বিচিত্র রূপের পরিচয় পাওয়া যায় উৎসব আঙ্গিনায়।

আমাদের প্রধান প্রধান উৎসবগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কোন কোনটি হাজার হাজার বছর আগেকার স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। সূত্রপাতের সময় উৎসবের যে রূপটি ছিল, আজ আর সে রূপ নেই। রূপের অনেক হের-ফের ঘটেছে। প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে নতুন উৎসব এসে জুটেছে। প্রাচীন উপাদানের সঙ্গে নতুন উপাদান মিলে অনেক উৎসব আবার নতুন রূপ ধারণ করেছে। বাংলার নিজস্ব অনেক উৎসবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, এমন কি বিদেশের প্রভাবও পড়েছে। উৎসবের রূপে হের-ফের ঘটলেও বাংলার জন-মানসে তার আকর্ষণ কমে যায়নি। তাই আজও বারো মাস বাঙ্গালীর ঘর ব্রত-পার্বণে পরবে-উৎসবে আনন্দমুখর হয়ে থাকে।

আমাদের উৎসবগুলি প্রধানত ধর্মীয় উৎসব হলেও এগুলি বিশেষ বিশেষ আনন্দকে উপলক্ষ করে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কারণ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনটা বড় একঘেয়ে—বৈচিত্র্যহীন। অবশ্য দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ যে একেবারেই নেই, তা নয়। আনন্দ আছে, তবে যেটুকু আছে তাতে মন ভরে না ; অধিকাংশ মানুষই চায় কর্মক্লান্ত জীবনের মাঝে একটু আনন্দ—নিছক আনন্দ। উৎসব এই নিছক আনন্দই এনে দেয় মানুষের জীবনে। প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবনযাত্রার মাঝে উৎসব এনে দেয় বৈচিত্র্য। তাতে মানুষ একঘেয়ে কর্মজীবন থেকে মুক্তি পায়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচে—পায় আনন্দ।

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব। মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়। এই যে সঙ্গ চাওয়া—এ শুধু কাজের প্রয়োজনে নয়, মনের প্রয়োজনেও বটে। তাই মানুষ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে। প্রতিদিনই অবশ্য এই মেলামেশা চলে, তবে সে মেলামেশার মধ্যে যেন একটু ফাঁক রয়ে যায়, বাধা থেকে যায়। উৎসবের দিনে এ বাধাটুকু কিন্তু আর থাকে না। ছোটবড় নির্বিশেষে আমরা তখন সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিই।

উৎসবের দিন বিশ্রামের দিন নয়—কাজের দিন। প্রতিদিন আমাদের যতটুকু পরিশ্রম করতে হয়, তার চাইতে অনেক বেশী পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় উৎসবের দিনগুলিতে। তবুও সে পরিশ্রম গায়ে লাগে না। কারণ তার বদলে আমরা লাভ করি অনাবিল আনন্দ। আর ঐ আনন্দলাভ করাটাই উৎসবের চরম সার্থকতা। তাই স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের সমাজে উৎসব পালন করার রীতি চলে আসছে।

এই অধ্যায়ে বাংলার কয়েকটি প্রধান প্রধান উৎসবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো। তার থেকে বাংলার উৎসব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

১। নববর্ষ: কালের গতি অবিরাম। কালের প্রবাহ দীর্ঘ এবং নিরবচ্ছিন্ন। সৃষ্টির সেই আদি হতে মানুষ কালের প্রবাহকে অনুসরণ

করে চলেছে। চলতে চলতে মানুষের মন হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। অবিরাম যাত্রাক্লান্ত মনটাকে তাই সে একটু বিশ্রাম দিতে চায়। চায় কালের বিরামহীন গতিপথে মাঝেমাঝে ছেদ টানতে। নববর্ষ কালের গতিপথের সেই ছেদ। নববর্ষ উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের আর একটি দিকের প্রকাশ পায়। মানুষ চায় অতীতের গ্লানিকে, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ধুয়ে মুছে ফেলে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে। মানুষের এই কামনারই বাহ্যরূপ আমরা দেখতে পাই নববর্ষের উৎসবের মধ্যে।

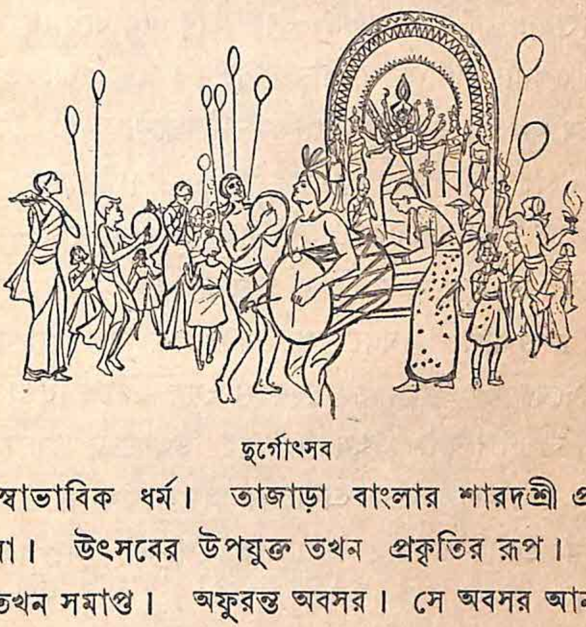
বঙ্গদেশে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১লা বৈশাখ তারিখে। এই তারিখে সূর্য মেষরাশিতে প্রবেশ করে। পুরোনো বছরের গ্লানি ও ব্যর্থতাকে ভোলবার জন্য বাঙ্গালীরা নানান উৎসবের মধ্যে দিয়ে নববর্ষকে বরণ করেন। প্রকৃতিও তখন উৎসবের অনুকূল হয়ে ওঠে। ফুলে-ফলে ধানের হরিৎ-শ্রী শোভায় প্রকৃতি ভরে থাকে।

নববর্ষের পুণ্য দিনটিতে বাঙ্গালী হিন্দুরা গঙ্গাস্নান, দানধ্যান, দেবতা দর্শন প্রভৃতি পুণ্য কাজ করে থাকেন। এই দিন থেকে আরম্ভ করে ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছে জলধারা দেন। গৃহদেবতাকে ধারাস্নান করান। আর গোটা বৈশাখ মাস ধরে গৃহদেবতাকে 'শীতলী ভোগ' দেন। শীতলী ভোগে দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় শরবত, ডাবের জল প্রভৃতি শীতল দ্রব্য। নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে বাংলার কোন কোন জায়গায় মেলা বসে।

নববর্ষের এই পুণ্য দিনেই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর হালখাতা বা নতুন খাতা আরম্ভ হয়। ব্যবসায়ী তাঁর দোকানঘর ফুল ও আমের পাতা দিয়ে সাজান। খরিদ্দার ও বন্ধু-বান্ধবদের দোকানে আমন্ত্রণ করেন। সবাইকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। ব্যবসায়ীর দেনাদারেরা ঐ ব্যবসায়ীকে কিছু অর্থ দেন।

নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বাংলা সালের (বঙ্গাব্দ) প্রথম দিনটিতে। খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৮/৭৯ বাদ দিলে শকাব্দ পাওয়া যায়। আর শকাব্দ থেকে ৫১৫ বাদদিলে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সাল পাওয়া যায়।

২। **শারদোৎসব**ঃ বর্ষার দুঃখ শেষে আসে শরৎ। তাই শরৎ এক সুখকর ঋতু। সুখকর ঋতুর সমাগমে আনন্দ প্রকাশ করা



দুর্গোৎসব

মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তাজাড়া বাংলার শারদশ্রী প্রাণবন্যার প্রাচুর্যে ভরা। উৎসবের উপযুক্ত তখন প্রকৃতির রূপ। কৃষকের কৃষিকাজ তখন সমাপ্ত। অফুরন্ত অবসর। সে অবসর আনন্দ দিয়ে ভরে তুলতে চায় বাঙ্গালী। তাই এ দেশে শরতের আবির্ভাব ঘটলে বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার আসে। কারণ দশভুজা দুর্গাদেবীর অর্চনার সময় তখন আগতপ্রায়।

কথিত আছে, সত্যযুগে রাজা সুরথ রাজ্যলাভের পর প্রথমে এই পূজা করেন। কিন্তু তাঁর পূজা শরৎকালে হয়নি, হয়েছিল বসন্ত কালে। এখন সে পূজা 'বাসন্তী পূজা' নামে খ্যাত। শরৎকালে

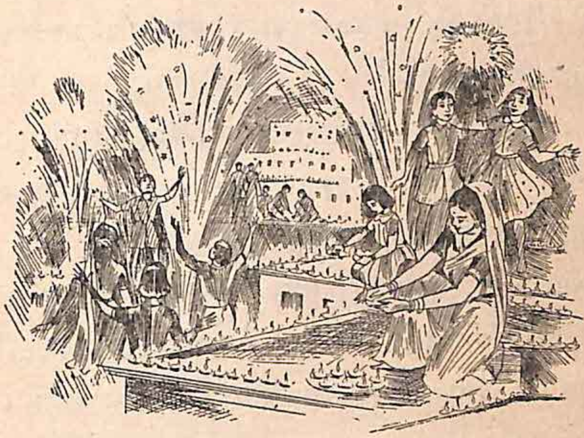
শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল-বোধন করেছিলেন। বাংলায় এই অকাল-বোধনেরই প্রচলন বেশী। দেবী দুর্গা—গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী। মহিষাসুর বধের সময় তিনি দশভুজা মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তাই দশভুজা মূর্তিতেই তিনি পূজিতা হন।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিন দিন ধরে মহাসমারোহে পূজা হয়। দশমীর দিন হয় দেবীর বিসর্জন। এই দিনটি তাই বিজয়া দশমী নামে খ্যাত। এই দিনে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর হিন্দুরা ঘরে ফিরে এসে পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারে প্রণাম, আশীর্বাদ বা আলিঙ্গন করেন। এতে সারা বছরের মনোমালিন্য দূর হয়ে যায়—পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব ফিরে আসে বা সুদৃঢ় হয়।

৩। দেওয়ালি: বঙ্গদেশে শরতের পর আসে হেমন্ত। শারদোৎসবের পর আসে এই হেমন্তোৎসব—দীপান্বিতা কালীপূজা, দেওয়ালি বা দীপাবলী উৎসব। এই উৎসবের রাতে ছোট বড় নির্বিশেষে সব হিন্দুর ঘরে প্রদীপের আলোকমালা শোভা পায়। ঘরে ঘরে প্রদীপের এই সমারোহ থেকেই 'দীপাবলী' কথাটি এসেছে।

বঙ্গদেশে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্যুরূপা এই মা অনাদিকাল থেকে বাংলা কেন, গোটা ভারতবর্ষের হৃদয় অধিকার করে রয়েছেন। ইতিহাস পালটেছে সমাজ ব্যবস্থায় ও সভ্যতায় এসেছে পরিবর্তন, কিন্তু এই ভয়ঙ্করী মায়ের প্রতি ভারতবাসীর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কমেনি। আগের মত মায়ের পূজা আজও চলে আসছে তেমনি আড়ম্বর সহকারে। কালী

মায়ের রূপের মহিমায় বাঙ্গালী আজও বিভোর। এই বাংলায় তাই দীপান্বিতা কালীপূজা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই পূজার দিন সন্ধ্যায় বাঙ্গালীর ঘরে জ্বলে ওঠে কোটি কোটি দীপশিখা—জ্বলে অসংখ্য আতসবাজি।



দীপালী

দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষে বাংলা কালীপূজায় মেতে উঠলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিন্তু এই কালীপূজার তেমন চলন নেই। সেখানে দীপান্বিতা উৎসবের রাতে কালীপূজার পরিবর্তে ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়।

৪। **শ্রীপঞ্চমী :** শীত এবং বসন্ত ঋতুর সন্ধিক্ষণে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে বাংলার ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবকে শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমী বলা হয়।

সরস্বতী বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী বৈদিক দেবী। সুদূর অতীতে বিশ্বজগৎ অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অতীতের কোনও এক শুভদিনে ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মার অন্তরলোকে

থেকে নিরস্ত করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন—এমন কি তাঁর প্রাণনাশেরও ভয় দেখিয়েছিলেন। তাতেও ফল হয়নি। প্রহ্লাদ তাঁর আরাধ্য দেবতাকে পরিত্যাগ করেননি।

অগ্নিতে হোলিকা ছিলেন অমর। সেই সাহসে একদিন তিনি প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিলেন। উদ্দেশ্য—অবাধ্য ছেলে প্রহ্লাদকে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দেবতার আশীর্বাদে প্রহ্লাদ রয়ে গেলেন অক্ষত আর হোলিকা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন।

হোলি উৎসবের আগের রাতে খড় বা বিচালীর তৈরি হোলিকার প্রতিমূর্তি আগুনে পোড়ানো হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে মন্দ বা অসত্যের বিনাশ সাধন।



হোলি

হোলি-উৎসব রঙের উৎসব। বয়স নির্বিশেষে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে হিন্দুরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। একে অপরকে আবির মাখিয়ে দেন। পিচকারির সাহায্যে পরস্পরের প্রতি রঙ নিক্ষেপ করেন। মত্ত হয়ে ওঠেন কৌতুকপ্রদ রং খেলায়।

জাগলেন জননী বীণাবাদিনী। হেসে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন। তারপর বীণার সুরে সুরে সুমধুর সঙ্গীতধারা বিস্তার করলেন। সেই মধুর সঙ্গীতধারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে বিস্তারিত হলো। ব্রহ্মা তখন মুগ্ধ নয়নে দেবী সরস্বতীর রূপলাবণ্য দেখতে লাগলেন। তিনি চতুর্মুখ হলেন এবং তাঁর চতুর্মুখ থেকে চতুর্বেদের আনন্দ গান ধ্বনিত হলো।

দেবী সরস্বতী শ্বেত শতদলে আসীনা। তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী। তাঁর চরণ প্রান্তে শ্বেত হংস। বাঙ্গালীর কাছে এই রূপেই দেবী সরস্বতী পূজিতা হন।

সরস্বতী দেবীর পূজা প্রধানত ছাত্র ও শিল্পীদের উৎসব। ছাত্ররা দেবীর সামনে বই-খাতা-দোয়াত-কলম ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। শিল্পীরা সাজিয়ে রাখেন তাঁদের শিল্প-সরঞ্জাম। দেবীর মূর্তি অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে পূজা করা হয়। পরদিন শোভাযাত্রা সহকারে সুসজ্জিত দেবীমূর্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী নদী বা কোন জলাশয়ের তীরে। সেখানে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়।

৫। হোলিঃ হোলি বসন্তোৎসব। এ উৎসবের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকগুলি কাহিনী প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বহুল প্রচারিত কাহিনীটি এই রকম ঃ

পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক দুষ্ট রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলের নাম প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদের বাবা হিরণ্যকশিপু এবং কাকা হোলিকা অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ ছিলেন ঈশ্বরভক্ত—বিষ্ণুর উপাসক। প্রহ্লাদের এই ঈশ্বরভক্তি হিরণ্যকশিপু ও হোলিকা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁরা প্রহ্লাদকে বিষ্ণুপূজা

বাংলার শ্রী ও মাধুর্যে ভরা দোল উৎসব—অনেকটা এই হোলি উৎসবেরই অনুরূপ। সুদূর অতীতে বৃন্দাবনে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে আনন্দোৎসবে মত্ত হয়েছিলেন। গোপিনীরা তাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে আবির ও লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোৎসবের সেই আদর্শ আজও বাংলায় প্রচলিত আছে—নামকীর্তন ও আবির-কুঙ্কুমে হোলি খেলা।

হোলির পূর্বদিন নারায়ণ পুজা হয়। তারপর চাঁচর উৎসব। বাঁশের ডগায় খড় ও তালপাতা মানুষের আকারে বেঁধে রাখা হয়। পূজার পর নারায়ণকে আবির দিয়ে মন্ত্রপূত করে পুরোহিত এই খড়ের মানুষে অগ্নিসংযোগ করেন।

পরদিন প্রত্যুষে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে দোলায় স্থাপন করে ফুল ও পাতা দিয়ে সাজিয়ে পূজা করা হয়, ভোগ দেওয়া হয়। তারপর রাধাকৃষ্ণকে আবির-কুঙ্কুমে সাজিয়ে সকলে হোলি খেলায় মত্ত হন।

৬। **নবান্ন**ঃ অগ্রহায়ণ মাস। বাংলার মাঠে মাঠে পাকা আমন ধানের সোনালী শীষ হাওয়ায় দুলছে। দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যে সেই ধান কাটা শেষ হয়েছে। ধান এসেছে গৃহস্থের ঘরে। এই ধান থেকে প্রস্তুত হয়েছে চাল। নিজে ব্যবহারের আগে গৃহস্থ সেই নতুন অন্ন প্রথমে উৎসর্গ করেন দেবতাকে, তারপর পিতৃপুরুষকে, কাক প্রভৃতি প্রাণীকে ও আত্মীয়-স্বজনকে। নতুন অন্ন উৎসর্গ করে গৃহস্থ নিজে সেই অন্ন গ্রহণ করবেন। নতুন ধান থেকে প্রস্তুত চাল প্রথম ব্যবহার উপলক্ষে যে উৎসব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়—সেই উৎসবই নবান্ন উৎসব।

নবান্ন মুখ্যত শস্যোৎসব কিন্তু এর আনন্দ শুধু কৃষকের ঘরেই সীমাবদ্ধ নয়। এ উৎসব ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। এ যেন মাটি ও মানুষের সহযোগিতার উৎসব। নতুন শস্যকে অভিনন্দিত করবার উৎসব। নতুন ধানকে অভিনন্দিত করবার উদ্দেশ্যে এইদিনে গৃহবধূরা লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান জানান—তাঁর পূজা করেন। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রশস্তি জানিয়ে তাঁরা গান ধরেন ঃ

ধান এলো ছালা ছালা
তাই তুলতে এত বেলা,
কোথার রাখি ধানের ছালা
ঐ দেখ না ধানের গোলা।
গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান
তাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।

৭। জন্মাষ্টমীঃ পৃথিবী মাঝে মাঝে পাপে পূর্ণ হয়। তখন পৃথিবীর মানুষ পাপ ও লোভের পথ বেয়ে চলে। দুষ্কৃতের অত্যাচারে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। তখন পাপের উচ্ছেদ ও পুণ্যের প্রবর্তনের জন্য দেবলোক হতে ভগবান ধরণীর ধুলায় নেমে আসেন মানুষের রূপ ধরে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাই করেছিলেন। সভ্যতার এক প্রথম ঊষায় তিনি আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবির্ভূত হয়েছিলেন—আমাদের জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও আদর্শকে স্বহস্তে গড়ে দেবার জন্য।

শ্রীকৃষ্ণের জনক দ্বারকানিবাসী নৃপতি বাসুদেব, জননী কংস রাজার ভগ্নী দেবকী। শ্রীকৃষ্ণ এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে রাতে প্রবল বারিবর্ষণ হয়েছিল। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। আর

বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনে তাঁর আগমন বার্তা দিকে দিকে বিঘোষিত হয়েছিল—দেবগণ তাঁর বন্দনাগান গেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে মানুষ নন, মানবাবতার নন—তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। তিনি ভারতের আত্মা। তাঁর স্মরণ, মনন ও অনুষ্ঠানে আমাদের অন্তরে প্রেম উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আমাদের জীবনে সকল দৈন্য, সব কার্পণ্য দূর হয়।

তখন দ্বাপর যুগের শেষ ভাগ। সেই সময় একদিন ভদ্রারোহিণী নক্ষত্রে দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাই ভাদ্রমাসেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব বা জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। জন্মাষ্টমী শুধু বাংলার নয়—সারা ভারতের উৎসব।

৮। বুদ্ধ পূর্ণিমাঃ আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় ভারতের পুণ্যভূমিতে ভগবান বুদ্ধ জন্ম লাভ করেছিলেন। জন্মস্থান—বর্তমান নেপালের লুম্বিনী। জন্ম সন খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দ।

সেকালে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যে শাক্যবংশের ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই শাক্যবংশেই জন্ম হয় সিদ্ধার্থ গৌতমের। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোধন।

রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ বড় হলেন। সংসারও পাতলেন। কিন্তু সংসারের অনিত্যতায় তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাই একদিন তিনি স্ত্রী-পুত্র-সংসারের মায়া ত্যাগ করলেন—হলেন গৃহত্যাগী।

গৃহত্যাগের পর গৌতমের ইচ্ছা হলো দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে হবে। তাই দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গেলেন রাজগৃহে—ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কাছে ; কিন্তু নিরাশ হলেন।

এরপর গৌতম গয়ায় গিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। ছ'বছর কঠোর কৃচ্ছসাধন করলেন। তাতেও ফল হলো না। পেলেন না খুঁজে মুক্তির পথ। তারপর কাশী। সেখানেও ধ্যানে তিনি মুক্তি-তত্ত্বকে খুঁজে পেলেন না। শেষে এলেন বুদ্ধগয়ায়। সেখানে বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসলেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একদিন সহসা মুক্তিতত্ত্ব তাঁর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হলো। তিনি শান্তি, বিদ্যালোক, জ্ঞান ও মোক্ষ লাভ করলেন—পেলেন বুদ্ধত্ব এবং তখন থেকেই জগতে 'বুদ্ধ' বা 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হলেন।



ধ্যানী বুদ্ধ

এই বুদ্ধদেবই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। আর অহিংসা, শান্তি সাম্য ও মৈত্রীই বৌদ্ধধর্মের সারকথা। অসংযত সুখভোগ অথবা সংযত কঠোর তপস্যা—কোনটাই বুদ্ধদেব ভালবাসতেন না। ভোগ বা তপস্যা—কোন পথেই বাড়াবাড়িটা ঠিক নয়। এই ছিল তাঁর মত। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথই ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ—নির্বাণ বা মুক্তি লাভের পথ।

গয়াতে বুদ্ধদেবের যে মহান উপলব্ধি হয় তার প্রথম প্রচার হয় সারনাথে। সারনাথ হতে তা ছড়িয়ে পড়ে রাজগৃহে ও শ্রাবস্তীতে। শ্রাবস্তী থেকে সারা ভারতে। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ভারতের গ্রামে-শহরে-প্রান্তরে বুদ্ধদেব প্রচার করেন তাঁর বাণী। তারপর দেহরক্ষা করেন উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে।

বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিনে ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় আমাদের দেশে। ঐ দিন কোটি কোটি মানুষ পরম করুণাময় বুদ্ধের আরাধনা করেন। এটি প্রধানত বৌদ্ধধর্মের উৎসব হলেও এদেশে সর্বধর্মের মানুষই নিষ্ঠাভাবে এ উৎসবে যোগ দেন।

৯। **মহরম :** মহরম মুসলমানদের একটি শ্রেষ্ঠ পর্ব। অতীতের এক করুণ কাহিনী এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত। সেইজন্য এটিকে



মহরম

আনন্দোৎসব আখ্যা দেওয়াটা ঠিক নয়—এটি একটি মর্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতি অনুষ্ঠান। আরবীয় বছরের প্রথম মাসের দশ তারিখে এই শোকাবহ উৎসবটি প্রতিপালিত হয়।

মুসলমানদের ধর্মগুরু মহম্মদের পৌত্র ছিলেন ইমাম হোসেন। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ রক্ষার জন্য কারবালার বিশাল মরুপ্রান্তরে কুটচক্রী এজিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইমাম হোসেন নিহত হলেন। তাঁর ঐ মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই মহরম উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মুসলমানেরা দশ দিন ধরে শোক পালন করেন। পরের দিন এবং তাঁর আগের দিন তাঁরা উপবাস ব্রত বা রোজা পালন করেন এবং মৃত মহাপুরুষদের পুণ্য আত্মার কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান—ধর্মশাস্ত্র কোরান পাঠ করেন।

তারপর কারবালার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পুনরাভিনয় করবার জন্য বিরাট শোভাযাত্রার এক অনুষ্ঠান হয়। ইমাম হোসেনের সমাধি মন্দিরের অনুকরণে কাগজের তাজিয়া তৈরি করা হয় এবং কল্পিত কারবালায় তা সমাধিস্থ করা হয়। 'হা হোসেন', 'হা হোসেন' বলে বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করতে করতে মুসলমানেরা তাজিয়ার শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। এই শোভাযাত্রায় একটি ঘোড়াকে বিশেষভাবে সাজিয়ে সঙ্গে নেওয়া হয়। নাম তার দুলদুল। দুলদুল ইমাম হোসেনের প্রিয় ঘোড়া ছিল।

মহরম একটি বিষাদময় স্মৃতি হলেও এক মহান আদর্শের প্রতীক। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামই এই উৎসবের আদর্শ।

১০। ঈদ-উজ-জোহা বা বকরঈদ: মহরমের মত এটিও মুসলমানদের একটি বড় পর্ব। এই পর্বের পশ্চাতে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই রকম:

ভক্ত এব্রাহামকে ঈশ্বর একবার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ এব্রাহাম, তোমার পুত্র ইসমাইলকে আমার উদ্দেশ্যে বলি দাও, তাতে সুখী হব।

এব্রাহাম প্রসন্নচিত্তেই ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে উদ্যত হলেন। ইসমাইলকে কাপড় দিয়ে ঢেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু সেখানে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। ঘাতক ইসমাইলকে যথারীতি বধ করে ইসমাইলের গায়ে জড়ানো কাপড়খানি খুললো। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় ইসমাইল! তাকে দেখা গেল তার পিতার পাশে দাঁড়ান অবস্থায়। আর বধ্যভূমিতে ইসমাইলের বদলে একটি ভেড়া বধ হয়েছে দেখা গেল। ঐশ্বরিক পরীক্ষায় এব্রাহাম জয়যুক্ত হলেন। তাঁর প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তির প্রমাণ মিললো। ঈশ্বর তুষ্ট হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

ভক্ত এব্রাহামের এই কাহিনী স্মরণ করেই বকরঈদ বা ঈদ-উজ-জোহা উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য হলো ত্যাগ ও উৎসর্গের শিক্ষা দেওয়া। ইসলামের বিধান অনুসারে এইদিনে নামাজের পর প্রত্যেক সমর্থ মুসলমানের পক্ষে পশু কোরবানি (উৎসর্গ) অবশ্য কর্তব্য। এই পবিত্র দিনে সকালে স্নান করে পবিত্র হয়ে গন্ধচর্চিত দেহে ভাল জামা-কাপড় পরে মুসলমানেরা ঈদ্‌গাহে যান। সেখানে একসঙ্গে নামাজ পড়েন। নামাজের পর কোলাকুলি ও প্রীতি সম্ভাষণের পালা। সকাল থেকে সবাইকে অভুক্ত থাকতে হয়। পশু কোরবানির পর আহার্য গ্রহণ করতে হয়। ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা একজনের নামে এবং গরু, মোষ, বা উট সাতজনের নামে কোরবানি করা বিধেয়।

১১। বড়দিন ঃ প্রতি বছর ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সারা ভারতে বড়দিন উৎসব পালিত হয়। বঙ্গদেশে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর

সংখ্যা কম নয়। তাই বাংলা দেশেও এ উৎসব বেশ বড় উৎসব। এটি খ্রীষ্টানদের একটি ধর্মীয় উৎসব—খ্রীষ্ট ধর্মগুরু যীশুর জন্মোৎসব। এই দিনটিতে খ্রীষ্টানদের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আলোকমালায় বাড়ি-ঘর সাজানো হয়।

সাজানো গীর্জায় প্রার্থনা শুরু হয় ২৪।২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রি থেকে। আর মহা-মানব যীশুর আবির্ভাবকে স্বাগত জানাবার জন্য ধর্মীয় গান গাওয়া হয়।


বড়দিন

১২। গুড্ ফ্রাইডেঃ খ্রীষ্টানদের আর একটি বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে গুড্ ফ্রাইডে। মার্চ বা এপ্রিল মাসের একটি শুক্রবারে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা যীশু এই দিনটিতে মানব-সমাজের মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাই তাঁর মহান আত্মদানকে স্মরণ করে এই দিনটিতে গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা হয় আর প্রার্থনা-সঙ্গীত গীত হয়।

আমাদের দেশে বারোমাসই কোন না কোন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর এই সব উৎসবের কতকগুলিকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ মেলাই অতি প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কতকগুলি গেছে লুপ্ত হয়ে। আবার কতকগুলি নতুন সৃষ্টি হয়েছে। কোন্ মেলা কতো প্রাচীন তার সঠিক বৃত্তান্ত মেলে না। মেলে না প্রচলিত মেলার মোট সংখ্যা কত। তবে সরকারী হিসাব মতে পশ্চিম বাংলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ১,৫১৯টি মেলা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়।

শুধু উৎসব ভাল লাগে না। আবার মেলা বসাতে হলে একটা উপলক্ষও চাই। তাই বোধ হয় উৎসবকে কেন্দ্র করেই মেলার আয়োজন হয়। উৎসবের নিজস্ব একটা আকর্ষণ আছে। সেই সঙ্গে মেলা থাকলে তো আর কথাই নেই। এই দুয়ের আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে অগণিত নরনারী গ্রাম থেকে গ্রামান্তর পেরিয়ে, মাইলের পর মাইল হেঁটে, পথের ক্লেশ সহ্য করে উপস্থিত হন উৎসব প্রাঙ্গণে। সেখানে দেবদর্শনে পুণ্যার্জন হয় আর মেলার বিচিত্র আনন্দ উপভোগও হয়।

বাংলার মেলাগুলির অর্থনৈতিক দিকটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মেলায় যে কেবল সৌখীন জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তা নয়। গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কৃষি ও কারিগরী কাজের জিনিসপত্রও

পাওয়া যায়। পাওয়া যায় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের মনোমত সামগ্রী। মেলায় ময়রা বসে হরেক রকম মিষ্টির ডালি সাজিয়ে। মনোহারী দোকানের প্রসাধনী দ্রব্য, খেলনা, ঘর সাজাবার জিনিস, কাচের চুড়ি, শাঁখা, পুঁতির মালা প্রভৃতি সবারই মনোহরণ করে।

পাথর, লোহা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়ম ও কলাই করা বাসনপত্রের দোকানে গৃহস্থবধূরা ভিড় করেন। বেত ও বাঁশের তৈরী ধামা-কুলো বা কাঠের পিলসুজ, বারকোষ প্রভৃতি কিনতেও গৃহিণীরা এগিয়ে যান। কৃষক যান কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি, বীজ ও চারাগাছ কিনতে। তাঁতের কাপড়, মিলের কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্চি, জামা-প্যান্ট-ফ্রকের দোকানেও ভিড় কম হয় না। মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল এমন কি জুতার দোকানেও বেচাকেনা ভালই হয়। অনেক ব্যবসায়ী সারা বছর গ্রামের মেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন। অল্প মূলধন-সম্পন্ন অনেক ফেরিওয়ালাও মেলায় মেলায় ঘুরে জীবিকার্জন করেন। গ্রামের শিল্পীরাও তাঁদের শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রীর সুযোগ পান মেলাতে।

বাংলা দেশের মেলায় যে শুধু দোকানপাটই থাকে—তা নয়, এখানে আমোদ-প্রমোদের আয়োজনও নিতান্ত কম থাকে না। যাত্রা, তরজা, কবিগান, পুতুলনাচ, সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা প্রভৃতিও থাকে।

এগুলির মাধ্যমে একদিকে বহু গ্রাম্য কবি, শিল্পী ও গায়ক জীবিকার্জনের সুযোগ পান। অন্যদিকে বঙ্গ সংস্কৃতি এই বিশেষ উপাদানগুলির বিকাশ ও পুষ্টিসাধন হয়—অব্যাহত থাকে বঙ্গ সংস্কৃতির এই বিশেষ ধারা।

আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় ছোটয়-বড়য় মিলিয়ে মেলার সংখ্যা অগণিত। সব কটি মেলার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো এই অধ্যায়ে।

১। মাহেশের রথের মেলাঃ 'রথতলা' নেই এমন গ্রামের সংখ্যা বঙ্গদেশে খুবই কম। আষাঢ় মাসে রথযাত্রাকে উপলক্ষ কর রথতলাতে রথের মেলা বসে। আগেকার দিনে রথের মেলা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। এখন সে সংখ্যা অনেক কমেছে। বাংলার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ রথের মেলাগুলির নাম করতে গেলে প্রথমেই মাহেশের রথের মেলার নাম করতে হয়।



রথের মেলা

হুগলী জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাহেশ। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দিরটি অতি প্রাচীন। রথযাত্রা উৎসবের আড়ম্বরও খুব বেশী এখানে। খ্যাতির দিক থেকে বিচার করলে বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের পরই এর নাম করতে হয়। রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মাহেশের জগন্নাথ-মন্দির সংলগ্ন মাঠ ও তার চারপাশে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মেলা বসে। সেই

মেলাই 'মাহেশের রথের মেলা' নামে প্রসিদ্ধ। পক্ষকালব্যাপী এই মেলায় আর পাঁচটি মেলার মতই দোকানপাট বসে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও আরও অনেক জেলা থেকেই অগণিত লোক আসেন এই মেলায়। রথের এই মেলার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বিভিন্ন রকম ফল, ফুল ও চারাগাছের দোকান। কারণ, গাছ লাগাবার এই উপযুক্ত সময়॥

২। সাগর দ্বীপের মকর-সংক্রান্তির মেলাঃ পুরাণে আছে মর্তে গঙ্গাদেবীকে নামিয়ে আনার কাহিনী। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ। কঠোর তপস্যাবলে মহাদেবের জটা-বিধৃত গঙ্গার পুণ্যধারাকে মর্তে প্রবাহিত করার কৃতিত্ব তাঁরই। স্বর্গ থেকে নেমে মর্তে গঙ্গা দেবী প্রবাহিত হয়েছিলেন এক মকর-সংক্রান্তি তিথিতে ; তাই মকর-সংক্রান্তি তিথিতে গঙ্গায় স্নান করা, দান করা ও পিতৃপুরুষের তর্পণ করা পুণ্য কাজ বলে বিবেচিত হয়।

চব্বিশ পরগণা জেলায় নির্জন নিঃসঙ্গ কপিলতীর্থ সাগরদ্বীপ। সাগর-সঙ্গমে এই সাগরদ্বীপ। মকর-সংক্রান্তির দিন স্নান-দান-তর্পণাদি পুণ্যকাজের লোভে এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। সাগর-সঙ্গম তখন মহামেলায় পরিণত হয়। এই উপলক্ষে প্রতি বছর এখানে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। সহস্রাধিক দোকানপাট আসে এই মেলায়। আর জনসমাগমও হয় দুই-তিন লক্ষ। শুধু বাংলা নয়—সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন সাগর-সঙ্গমে পুণ্য সঞ্চয় করতে ও মেলায় যোগ দিতে।

৩। কৃষ্ণনগরের বারোদোলের মেলাঃ চৈত্রমাসের শুক্লাএকাদশী তিথিতে বারোদোলের মেলা অনুষ্ঠিত হয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে। মেলা বসে নদীয়ার রাজবাড়ি সংলগ্ন বিরাট মাঠটিতে।

এখানে বারোদোলের 'দোল' অর্থে বোঝায় দেব-বিগ্রহদের দোলান। আর নাম বারোদোল হলেও দেব-বিগ্রহের সংখ্যা কিন্তু বারো নয়—তেরটি। শোনা যায় যে, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্র রায় এই উৎসব প্রবর্তন করেন।

বারোদোল উৎসব উপলক্ষে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে দেব-বিগ্রহগুলিকে নিয়ে আসা হয় রাজবাড়িতে। তারপর রাজবাড়ির মন্দিরে তিন দিন ধরে পূজার্চনা চলে। বারোদোলের মেলা এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই।

ধর্মীয় উৎসব তিন দিন ধরে চললেও মেলাটি চলে মাসাধিক-কাল। বহু যাত্রী আসেন মেলায়। নদীয়া জেলার যাত্রী তো বটেই, পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি জেলার লোকেরাও আসেন এ মেলায়। এই মেলায় নদীয়া জেলার কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যেরই প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। বলতে গেলে এই মেলা কৃষ্ণনগর তথা সমগ্র নদীয়া জেলার সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ।

৪। **কেঁদুলির মেলা :** লোকমুখে কেঁদুলি। আসল নাম কেন্দুবিল্ব। গ্রামটি বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে। রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব। কবি জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাস ছিল এই কেঁদুলি গ্রাম। জনশ্রুতি এই যে পৌষ-সংক্রান্তির দিন কবি জয়দেব অজয় নদের তীরে কদম্ব খণ্ডীর ঘাটে তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধামাধবের বিগ্রহ খুঁজে পান। অনেকের বিশ্বাস—সেই থেকে এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তির দিনে জয়দেব-স্মারক মেলার সূত্রপাত হয়। গ্রামে একটি সুন্দর মন্দিরে আজও রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পৌষ-সংক্রান্তির জয়দেব স্মারক মেলায় এই গ্রামটি কয়েক

দিনের জন্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার যাত্রী সমাগম হয় গ্রামে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাউলেরা একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে মেলায় এসে হাজির হন। এই বাউল সমাবেশ ও বাউল গান কেঁদুলির মেলার এক প্রধান আকর্ষণ।

মেলা চলে পাঁচদিন ধরে। দূর-দূরান্তর থেকে বহু কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা আসেন মেলায় যোগ দিতে। অনেক দোকানপাট বসে। কাঠের দরজা-জানালা, টেবিল-চেয়ার, পালকি মাছ ধরার জাল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী হয় মেলায়।

এ মেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অন্নসত্র। হাজার হাজার যাত্রী এই অন্নসত্রে খেয়ে যান। কত শত মণ চাল রান্না হয় তার ইয়ত্তা নেই! যাত্রীরা বিশাল বটগাছের তলায় আশ্রয় নেন। সাময়িক কিছু তাঁবু পড়ে। তাতেও অনেক যাত্রী আশ্রয় পান। আর থাকে হাজার খানেক গরু-মোষের গাড়ি। বেশীর ভাগ যাত্রীকে আশ্রয় দেয় সেই সব গাড়ি।

৫। **নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও খড়দহের রাসের মেলা** ঃ রাস পূর্ণিমায় রাসযাত্রার উল্লেখযোগ্য মেলা বসে তিন জায়গায়। নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে এবং চব্বিশ পরগনা জেলার খড়দহে। এই তিন জায়গার রাসের মেলাই প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধও বটে। এত সমারোহ বাংলার আর কোন রাসের মেলাতে দেখা যায় না।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাসমেলা চলে তিন দিন ধরে। রাসোৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য সম্পন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করা হয়। উৎসবকালে ঐ সব বৃহদাকার মূর্তিগুলিকে নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা বের করা হয়। নবদ্বীপের রাসোৎসবের এইটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। শান্তিপুরের রাসোৎসবের বৈশিষ্ট্যটি দেখা

যায় রাস-পূর্ণিমা থেকে তৃতীয় দিনে। ঐ দিনে ভাঙ্গা রাস উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ীর নিত্য সেবিত প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে 'রাইরাজা শোভাযাত্রা' বের করা হয়।

খড়দহেও রাসযাত্রা উপলক্ষে তিন দিন ধরে উৎসব চলে—মেলা বসে। এখানে শ্যামসুন্দরজীর মন্দির আছে। মন্দিরে শ্যামসুন্দর দেবের পূজার্চনার পর উৎসব হয়। এখানকার রাসোৎসবের বৈশিষ্ট্য হলো—গোষ্ঠবিহার মিছিল।

শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও খড়দহের রাসের মেলায় প্রতি বছরই যাত্রী সমাগম খুব বেশী হয়।

৬। বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা: বীরভূম জেলার সিউড়ী থেকে চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর। এখানে শিব হলেন বক্রেশ্বর—বক্রনাথ। তাঁর মূল মন্দিরটি বেশ বড়। এটি কিন্তু বাংলা মন্দির নয়—উড়িষ্যার রেখ দেউলের মতন মন্দির। বক্রেশ্বরে শিব যেমন আছেন—তেমনি আছেন শিবানী। শিবানী এখানে মহিষমর্দিনী। বক্রেশ্বর তীর্থক্ষেত্রের পূর্বদিকে ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদ আর দক্ষিণে পাপহরা নদী।

অতি প্রাচীনকাল থেকে বক্রেশ্বরের শিবমন্দিরে সাড়ম্বরে উৎসব পালিত হয়। আর সেই উৎসব উপলক্ষে পাঁচ দিনব্যাপী এক বিরাট মেলা বসে। একে তীর্থক্ষেত্র, তার ওপর সেখানে বসে মেলা—কাজেই মেলায় যাত্রী সমাগম হয় অগণিত।

৭। জলপাইগুড়ির শিবরাত্রির মেলা: কিংবদন্তী আছে যে দশম শতাব্দীর শেষভাগে জিতারিমুনি নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জলপাইগুড়িতে জল্পীশ পীঠ স্থাপন করেন। সেখানে জল্পেশ্বর শিব মন্দির গড়ে ওঠে। এই শিবমন্দির সংলগ্ন মাঠে শিবরাত্রি উৎসব

উপলক্ষে প্রতি বছর বেশ বড় একটি মেলা বসে। এই মেলা একমাস ধরে চলে।

মেলায় হাজার খানেক দোকান বসে। প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী আসেন মেলায়। আগেকার দিনে এই মেলাটি প্রধানত পশু বিক্রীর মেলা হিসাবে খ্যাত ছিল। তখন মেলায় ভুটিয়া ঘোড়া, ছয় শিংওয়ালা ভেড়া, তিব্বতী কুকুর, তিব্বতী শাল, কম্বল প্রভৃতি বিক্রী হতো। এখন এটি একটি সাধারণ মেলায় পরিণত হয়েছে।

৮। **ঘোষপাড়ায় সতীমার দোল মেলাঃ** ঘোষপাড়া নদীয়া জেলার একটি গ্রাম। এটি বৈষ্ণবদের, বিশেষ করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এক পুণ্যতীর্থ। ভক্তেরা বলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে যবন-প্রীতি ও হরিজন সেবার মনোমত পথ খুঁজে পাননি। তাই নতুন পথ প্রবর্তনের জন্য তিনি ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদরূপে আবির্ভূত হন। আউলচাঁদ হচ্ছেন 'গুরু সত্য' মন্ত্রের প্রবর্তক। তাঁর ভিটা ছিল কল্যাণীর অনতিদূরে ঘোষপাড়াতেই।

দোল-পূর্ণিমার দিন আবির নিয়ে দোল খেলবার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী আসেন ঘোষপাড়ায়। দোল উৎসব উপলক্ষে সতী-মা ও আউলচাঁদের ভিটা সংলগ্ন লিচু বাগানে ও হিমসাগর দীঘির পাড়ে এক বিরাট মেলা বসে। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে আউল-বাউলের সমাবেশ এবং তাঁদের লীলাকীর্তন ও দেহতত্ত্বমূলক গান।

৯। **মাকড়দহের দোল-মেলাঃ** দোল উৎসব বলতে আমরা সাধারণত রাধাকৃষ্ণের দোল উৎসবই বুঝি। কিন্তু বাংলার অনেক

গ্রাম্য দেবদেবীকে নিয়েও দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাকড়দহের মাকড়চণ্ডীর দোল উৎসব অনেকটা সেই রকমই।

কথিত আছে যে শ্রীমন্ত সওদাগর হাওড়া জেলার মাকড়দহ গ্রামে দেবী চণ্ডীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই দেবীই মাকড়চণ্ডী দেবী নামে খ্যাত। মাকড়দহ হাওড়া শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে অবস্থিত। মাকড়চণ্ডীর পঞ্চম দোল উৎসব উপলক্ষে এখানে একপক্ষ কালব্যাপী এক মেলা বসে। গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী সমাগম হয় এই মেলায়। মেলায় কুটির শিল্পজাত বহু বস্তুই আসে। তার মধ্যে মাদুর অন্যতম। এই মেলার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাজি পোড়ানো। উৎসব প্রাঙ্গণে মধ্যরাত্রি থেকে অবিরাম বাজি পোড়ানো হয়।

১০। গাজনের মেলা: বাংলার লোক-উৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গাজন উৎসব। গাজনের ঢাকের আওয়াজ শোনেনি এমন লোক বাংলা দেশে বিরল। চৈত্রের শুরুতেই শিব ঠাকুরের ভক্তের দল ধ্বনি তোলেন 'ভাঙ্গড় ভোলার চরণে সেবা লাগে, মহাদেব'—এই ধ্বনি দিয়ে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেন যে গাজন উৎসব আগত প্রায়।

গাজন উৎসব শুরু হয় সাধারণত চৈত্র মাসের ২৭ তারিখে। আর শেষ হয় চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। গাজন উৎসব উপলক্ষে বাংলার কয়েকটি অনুষ্ঠান খুব উল্লেখযোগ্য। সেই অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে সন্ন্যাস গ্রহণ, লীলাবতী পূজা, চড়কপূজা এবং গাজুনে সন্ন্যাসীদের নাচ। গাজন উৎসব উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি মেলা বসে। সেই মেলাগুলিকেই বলা হয় 'গাজনের মেলা।

হুগলী জেলার তারকেশ্বর। দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ এইখানেই। তারকেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে তারকনাথের বাঁ

পাশে বাসুদেব। পটাঙ্কিতা দুর্গা, অন্নপূর্ণা ও কালিকাও আছেন পাশে। তাঁদেরও নিত্যপূজা হয়।

তারকেশ্বরের গাজন উৎসব খুব বিখ্যাত। উৎসব আরম্ভ হয় চৈত্রের প্রথমেই॥ উৎসব উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে এখানে। মেলায় রামনগরের সন্ন্যাসীদের 'কাঁটা ঝাঁপ' এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়ে ও পুরুষ ভক্তদের 'কালকে পাতারি নাচ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব ও মেলা চলে চারদিন ধরে।

নদীয়া জেলার নবদ্বীপের এবং বর্ধমান জেলার বোড়ো গ্রামের গাজনের মেলাও উল্লেখযোগ্য॥

বাংলার এই মেলাগুলি বহুজনের মিলনক্ষেত্র—বাঙ্গালী সংস্কৃতির একটি অপূর্ব বিকাশ। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ ও ভাব বিনিময়ের এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র। মেলা পল্লীবাসীদের নিরানন্দ, বৈচিত্র্য হীন একঘেয়ে জীবনের বৈচিত্র্যের স্বাদ বয়ে আনে। সহজ ও সস্তায় আনন্দ দেয় পল্লীবাসীকে। তাই পল্লীবাসীরা সারা বছর ধরে এই মেলার প্রতীক্ষায় বসে থাকেন।

বাংলার শিল্পকলা

বাংলার শিল্পচেতনা ধর্ম, লোকাচার, দেশাচার, সমাজ ব্যবস্থা, মহাকাব্য প্রভৃতি একাধিক বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাংলার শিল্পী তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন মন্দিরের দেওয়ালে, কুঁড়ে ঘরের গায়ে, লোহা-কাঁসা-পেতলে, রেশমে, হাতীর দাঁতে, ঘটে-পটে। বাংলার শিল্পীদের সেই শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

১। **গজদন্ত শিল্প ঃ** বাংলার গজদন্ত শিল্পের পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ জেলা। শিল্পীরা ছড়িয়ে আছেন বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জে। নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদে এই শিল্পটি বিকাশ লাভ করে। আবার নবাবদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পটিরও অবনতি শুরু হয়। মুর্শিদাবাদের গজদন্ত শিল্পীরা 'পাষাণ-ধারার ভাস্কর' নামে পরিচিত। এঁরা বৈষ্ণব। এঁদের শিল্পকাজের উপযোগী গজদন্ত আসে আসাম ও মহীশূর থেকে। সুদূর আফ্রিকা থেকেও আসে। 'হাইড্রোজেন পার অকসাইড' নামক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে গজদন্ত এঁরা সাদা করে নেন। তারপর উকো, বাটালি, ভুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পদ্রব্য তৈরি করেন। এঁরা হাতীর দাঁতের চুড়ি, বালা ইত্যাদি গহনা গড়েন, বাক্স গড়েন, গড়েন নানা দেবদেবীর মুর্তি। আর গড়েন নৌকা, গরুর গাড়ি, রথ ও নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। দেশ-বিদেশে হাজার হাজার টাকা দামেও বিকোয় এঁদের কোন কোন সামগ্রী। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কাজে যে সৌকুমার্য ও সাবলীলতা আছে, ভারতের অন্যান্য স্থানের কাজে তা নেই।

পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদে কি ভাবে গজদন্ত শিল্পের আবির্ভাব ঘটলো সে সম্পর্কে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। একদা মুর্শিদাবাদের কোনও এক নবাবের ইচ্ছা হয় কানে সুড়সুড়ি দেবার। তখন জনৈক পরিষদ নবাবকে একটি কাঠি দেন। নবাব সেটি পেয়ে বলেন ঃ নবাব দেবেন কানে কাঠি! হাতির দাঁতের কাঠি পাওয়া যায় না?

সেই সূত্রেই নবাব দিল্লী থেকে মুর্শিদাবাদে আনালেন এক মুসলমান গজদন্ত শিল্পীকে। মুসলমান শিল্পীর কাজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলেন এক হিন্দু শিল্পী। আজকের গজদন্ত শিল্পীরা সেই হিন্দু শিল্পীরই বংশধর।

২। **মৃৎশিল্প ঃ** নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহর মৃৎশিল্পের পীঠস্থান। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে নদীয়া জেলার মৃৎশিল্পের সূচনা হয়। মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটোর হতে কয়েকজন মৃৎশিল্পী কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস শুরু করেন। প্রথমে তাঁরা হাঁড়ি, কলসী, তৈজসপত্র প্রভৃতি তৈরী করতেন। পরে রাজার আদেশে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দেবমূর্তি গড়া শুরু করেন। হটুপাল নামে জনৈক শিল্পী প্রথম ষড়ভুজ মৃন্ময় মূর্তি গড়েন। বংশ পরম্পরায় এই শিল্পীরা উন্নত করতে থাকেন। তাঁদের শিল্পকর্মের নাম হয়, যশ হয়। ধীরে ধীরে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের জগৎজোড়া খ্যাতি হয়।


মাটির খেলনা


মাটির খেলনা

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা মূর্তি গড়েন দেবদেবীর ও মানুষের। গড়েন নানা ঢঙের রংদার পুতুল ও জন্তু-জানোয়ার। গড়েন মাটির

একেবারে ফেটে পড়লেন দেবী দুর্গা। শাঁখারীকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শাঁখারীবেশী শিব নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। তারপর দেবী দুর্গাকে বললেন: পরীক্ষায় তুমি জয়যুক্ত হয়েছ। তুমি সত্যই পতিব্রতা।

এই দেশে শাঁখাকে তাই বলা হয় সাবিত্রী-শাঁখা। নব বিবাহিতাকে গুরুজনেরা তাই আশীর্বাদ করে বলেন: তোমার শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হোক।

বাংলার কয়েকটি জায়গা শঙ্খ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। কলকাতায় শাঁখের কারখানা আছে জোড়াসাঁকোয় ও কেশব সেন ষ্ট্রীটে। এ ছাড়া শাঁখা তৈরী হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও হাতগ্রামে, নদীয়ার রাণাঘাট ও নবদ্বীপে, হুগলীর ভদ্রেশ্বর ও চন্দননগরে, বর্ধমানের পাটুলি ও কাটোয়ায় এবং মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। তৈরি শাঁখার আমদানী হয় কলকাতায়।

শঙ্খ ওঠে সমুদ্র থেকে—বড় ও ছোট সব আকারেরই। বড়গুলি থেকে হয় শাঁখ বা শঙ্খ, ছোটগুলি থেকে হয় শাঁখা। খুব ছোটগুলি থেকে কাগজ-চাপা তৈরি হয়। মাদ্রাজ থেকে শঙ্খের চালান আসে এখানে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অগভীর জলে টারবো ও ট্রোকাস নামে দু'রকমের উজ্জ্বল শামুক বা ঝিনুক পাওয়া যায়। এগুলি থেকে নানা রকমের গহনা, চামচ, ছাইদান প্রভৃতি কলকাতায় তৈরী হয়।

৫। **মাটির পুতুল**: এ দেশে মাটির পুতুলের একটি সুন্দর ধারা বর্তমান। এ ধারাটি গ্রাম-আশ্রয়ী কারুশিল্পের ধারা। এই ধারার মধ্যে পড়ে রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবী। তাছাড়া জেলে-বৌ, কুকুর, বেড়াল, মাছ, মকর ইত্যাদিও ঐ গ্রাম-আশ্রয়ী শিল্পধারার মধ্যে পড়ে।

বাংলার এক এক স্থানের পুতুলের গড়ন এক এক রকম। কোথাও পুতুল সরলতার প্রতীক। কোথাও বা পুতুল নিপুণ হাতে চিত্রিত। বাংলার পুতুল বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতির ধারক। মাটির পুতুলের জন্য বিখ্যাত হচ্ছে ২৪-পরগনার জয়নগর-মজিলপুর, বীরভূমের রাজনগর, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া ও রাজগ্রাম এবং মেদিনীপুরের নাড়াজোল। পাঁচমুড়ার তৈরি ঘোড়া তো জগদ্বিখ্যাত। এই ঘোড়াকে বাংলার কারুশিল্পের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।


মাটির ঘোড়া
(পাঁচমুড়া)

বাংলায় শুধু মাটির পুতুলই মেলে না, মেলে কাঠের পুতুলও। কাঠের পুতুলের জন্য বিখ্যাত বর্ধমানের নতুনগ্রাম। নতুনগ্রামের সূত্রধরেরা গড়েন কীর্তনরত গৌরমূর্তি, গড়েন কালীঘাটের পুতুল। কালীঘাটের পুতুল কালীঘাটে কদাচ তৈরি হয় না—তৈরি হয় নতুনগ্রামে, দাঁইহাটে ও পাটুলিতে। নতুনগ্রামে নানা দেব-দেবীর মূর্তি ভিন্ন তৈরি হয় প্যাঁচা। বীরভূমের কারিধ্যা, রাজনগর ও দুবরাজপুরের মাটির পুতুলও বিখ্যাত।

৬। মাদুর শিল্প ঃ বাংলার মাদুর শিল্পটি অতি প্রাচীন। এর আশ্রয় হলো দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ। গ্রামের মানুষের কাছে মাদুর আজও অত্যাবশ্যক সামগ্রী। ২৪-পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় তৈরি হলেও বাংলার মাদুরের সবচেয়ে বড় উৎপাদন এলাকা হচ্ছে মেদিনীপুর জেলা। সাধারণত মাদুর উপরোক্ত সব কটি জেলাতেই তৈরি হয়। কিন্তু অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য 'মসলন্দ' মাদুর তৈরি হয় একমাত্র মেদিনীপুর জেলায়।

মেদিনীপুর জেলার আর একটি প্রধান কারুশিল্প হলো মোষের

ফলমূল, তরিতরকারি, মশলা ও পোকামাকড়। শিল্পীদের নিপুণ হাতের স্পর্শ পেয়ে সবই যেন মনে হয় জীবন্ত। মাটির চিংড়ী মাছের পাশে আসল চিংড়ী সাজিয়ে রাখলে বোঝা দায় হয়—কোনটা মাটির আর কোনটা আসল।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণী অঞ্চলে মৃৎশিল্পীদের বাস। এই ঘূর্ণীরই গোপেশ্বর পাল ১৯২৪ সালের 'বৃটিশ স্যাম্পল ফেয়ার'-এর প্রদর্শনীতে ডিউক অফ কনটের মূর্তি পাঁচ মিনিটের মধ্যে গড়ে যশের মালা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

৩। **শোলা শিল্প** : শোলা জলজ উদ্ভিদ। বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই শোলা জন্মে। এই শোলা দিয়ে তৈরি হয় ডাকের সাজ। প্রতিমা সাজাতে লাগে এই ডাকের সাজ। তাছাড়া বরের টোপর, কনের মুকুট তৈরী হয় শোলায়। শোলায় তৈরী কদমফুল, পদ্মফুল, চাঁদমালা প্রভৃতি নানান্ উৎসব অনুষ্ঠানে লাগে। তাছাড়া শোলা দিয়ে টুপি ছিপি ইত্যাদিও তৈরি হয়। শোলার জন্তু জানোয়ার আর জাল দিয়ে তৈরি 'ইন্দ্রজাল' রাসলীলার এক অত্যাবশ্যক উপাদান।


শোলার টোপর

যে সব শিল্পীরা শোলার কাজে পারদর্শী তাঁরা মালাকার নামে পরিচিত। নদীয়া জেলাতেই শোলার কাজ জানা মালাকারের সংখ্যা বেশী। এ জেলার কালীগঞ্জ, মাটিয়ারী এবং কৃষ্ণনগরেই শোলা শিল্পীদের বেশী দেখা যায়। এছাড়াও হুগলীর ডানকুনি, হাওড়ার বালি-বারাকপুর, আমতা, চব্বিশ পরগনার খড়দহ, মেদিনীপুরের তমলুক ও গড়বেতা, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী, বর্ধমানের

কাটোয়া ও দোমোহানী, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ও বেলাডাঙ্গা এবং বীরভূমের কয়েক জায়গায় মালাকারেরা ছড়িয়ে আছেন।

বালি-বারাকপুরের এক শোলাশি [illegible] তরি হনুমানের মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে। সেটি বাংলার শোলা শিল্পের উন্নত আর্টের পরিচয় দেয়। শোলার কাজের কিছু ভাল কারিগর আছেন চন্দননগরে। জগদ্ধাত্রী পূজায় অপূর্ব ডাকের সাজের পুরানো চন্দননগরের বিশাল প্রতিমা এই কারিগরদের দক্ষতার পরিচয় দেয়।

৪। **শঙ্খ শিল্প**ঃ দুর্গা যাবেন বাপের বাড়ি। অনুমতি মিলেছে শিবের। কিন্তু একেবারে খালি হাতে এবার আর বাপের বাড়ি যেতে চান না দুর্গা। কারণ তাঁর পিতা সেবার তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেনঃ তোর স্বামীর কি এমন অবস্থা নেই যে তোকে একজোড়া শাঁখা কিনে দেয়!

ভারি মনে লেগেছিল দুর্গার সেদিন। তাই এবারে বাপের বাড়ি যাবার আগে একজোড়া শাঁখা তাঁর চাই-ই। কিন্তু শিব বলেনঃ শাঁখা কিনে দিতে আমি অপারগ।

তাই মনের দুঃখেই দুর্গাকে যেতে হল পিত্রালয়ে। সেখানে মহারাজ দক্ষের অন্তঃপুরে একদিন এক শাঁখারী এলো।

দেবী দুর্গা ভাবলেন—তাঁর বাবা দক্ষই বুঝি অন্তঃপুরে পাঠিয়েছেন শাঁখারীকে। তাই না ভেবে তিনি তো মহানন্দে শাঁখা পরতে বসলেন। কিন্তু যতবারই তিনি শাঁখা পরতে যান, ততবারই শাঁখা যায় ভেঙ্গে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! শাঁখারী বিরক্ত হয়ে শেষকালে বললঃ আপনি নিশ্চয়ই পতিব্রতা নন, নইলে বার বার শাঁখা ভাঙ্গবে কেন?

—কি এত বড় কথা! আমি পতিব্রতা নই। ক্রোধে

শিঙের কাজ! এখানকার শিল্পীরা মোষের শিঙের চিরুণী, চামচ, ছোটখাট জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি ইত্যাদিও তৈরি করে থাকেন।

৭। **পট শিল্প**ঃ এ দেশে মালাকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি নয় শ্রেণীর শিল্পী আছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন চিত্র কররাও বাংলার চিত্রকরদের কাজ প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) কাপড় বা কাগজের মোড়কের উপর নানা বিষয়-বস্তু সম্বলিত চিত্র আঁকা। এই শ্রেণীর চিত্রকে বলা হয় পট। আর তার শিল্পীদের বলা হয় পটুয়া। (খ) কাঠের উপর চিত্র আঁকা। (গ) রঙদার পুতুল তৈরি করা। (ঘ) ঘট, সরা, কুলা প্রভৃতির উপর রঙীন নক্সা আঁকা।

বাংলার শিল্পীরা পটে আঁকেন শিব-পার্ব্বতীর লীলা, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা। আঁকেন দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির দেবীমূর্তি। আঁকেন কৃষ্ণলীলা, রাবণ-বধ, সীতা-হরণ, রামের বনবাস প্রভৃতি আখ্যায়িকার চিত্র। এ ছাড়াও এঁদের আঁকা গোঁসাইপট, বৈষ্ণব কাহিনী, গাজীর পট (মহম্মদের জীবনী), ডাকাতের পট প্রভৃতি বিখ্যাত।

হাতে তৈরি কাগজ, আলতা, গঁদ, তেঁতুলের কাই, ডিমের খোলা বেলের আঠা, ধুনা, চাঁচগালা, কাঠ কয়লা, হরিতাল, তুঁত, চীনে সিঁদুর কাঠখড়ি ও মীনা পটুয়াদের সম্বল। আর সম্বল তাঁদের হাত ও তুলি।

সারা পশ্চিম বাংলাতেই এককালে পটুয়াদের বাস ছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের কেশবপুর, চৈতনপুর, দেউলপোতা, সিরুই, নাড়াজোল, তমলুক প্রভৃতি স্থানের পটুয়ারা ছিলেন বিখ্যাত। আর বিখ্যাত ছিলেন বেলেঘাটা, কালীঘাট, জয়নগর-মজিলপুর, সোনারপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের পটুয়ারা। আজ নানা অভাব অভিযোগ ও দারিদ্র্যের কবলে পড়ে বাংলার পটুয়াদের প্রতিভা ক্ষয়ের পথে।

৮। **ধাতুর মূর্তি শিল্পঃ** গত কয়েক বছর ধরে ডোকরা কামারদের কাজ সারা ভারতে বেশ প্রশংসা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এঁদের তৈরী শিল্পদ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ডোকরা কামারদের শিল্পপদ্ধতি উপজাতি শিল্পচেতনা থেকে আহরিত। পশ্চিম বাংলায় ডোকরাদের নয়-দশটি পরিবার আছেন বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে। কিছু পরিবার আছেন বর্ধমান জেলার দরিয়াপুরে। কিছু আছেন আসানসোলের কাছে। আর কিছু ডোকরা শিল্পী পরিবার ছড়িয়ে আছেন বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে।

ডোকরা কামারেরা প্রায় ভবঘুরে জাতি। মোমের তৈরি নানারকম সুন্দর মূর্তি ও পাত্র সোজাসুজি ছাঁচে পুড়িয়ে এঁরা পেতলে ঢালাই করে নেন। ওঁদের ঢালাইয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত আদিম ধরনের। মূর্তির গড়নও তাই। কিন্তু শিল্প-সৌষ্ঠবের দিক থেকে ওদের কাজগুলি রসোত্তীর্ণ। ডোকরাশিল্পীদের শিল্পকাজের নানান জিনিস চোখে পড়ে। তার মধ্যে দেব-দেবীর মূর্তি, জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৯। **কংস শিল্প:** কাঁসা এককালে গ্রাম বাংলায় সোনার মত সম্পত্তি ছিল। গহনার মত বন্ধক দিয়ে অসময়ে টাকা ধার পাওয়া যেত। সেকালে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে কাঁসার বাসন সমাদর পেত। আজ মরীচাহীন ইস্পাত, অন্যান্য ধাতু ও সঙ্কর ধাতুর দৌলতে কাঁসার আর তত সমাদর নেই। কাঁসা শিল্প আজ ধ্বংসোন্মুখ। বিয়ে উপলক্ষে সমাজের প্রায় সর্বস্তরে নবদম্পতীকে কাঁসার বাসন উপহার দেওয়ার রেওয়াজটি কিন্তু খুবই প্রাচীনকালের। এ রেওয়াজ আজও অব্যাহত আছে। বলতে গেলে এই রেওয়াজটির জন্যই কাঁসা শিল্প এখনও বেঁচে আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। আর প্রসিদ্ধ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুরের ঘাটাল ও মহিষাদল, বর্ধমানের বনপাশ ও দাঁইহাট, হুগলীর আরামবাগ ও বাঁশবেড়িয়া এবং নদীয়ার মুড়াগাছা ও নবদ্বীপ।

কংস শিল্প পশ্চিম বাংলার কুটির শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহৎ শিল্প। এ শিল্পটি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে বহুদিন ধরে।

১০। **বংশ শিল্প ঃ** কলকাতার কাছেই সোনারপুর অঞ্চলে তৈরি হয় বাঁশের তৈরি নানান সৌখিন ঘর সাজাবার জিনিস। পানিহাটি অঞ্চলের মেয়েরাও বাঁশের শৌখিন শিল্পদ্রব্য তৈরি করে থাকেন। শান্তিনিকেতনের কাছেই বাঁধগোড়া গ্রাম। সেখানকার মোড়া বিখ্যাত।

১১। **তাঁত শিল্প ঃ** বাংলা আজও তাঁত যন্ত্রের জন্য বিখ্যাত। গোটা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তন্তুবায়েরা। তাঁতবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত স্থান হচ্ছে নদীয়ার শান্তিপুর, বাঁকুড়ার রাজগ্রাম, সোনামুখী ও বিষ্ণুপর, বীরভূমের বোলপুর, বর্ধমানের দেবীপুর ও অম্বিকা-কালনা। এ ছাড়াও বিখ্যাত শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও ধনেখালির নকসি তাঁতের কাপড়।

১২। **রেশম শিল্প ঃ** রেশম, এণ্ডি, তসর, মুগা—সবই সিল্ক। তবে রেশমই এদের মধ্যে উৎকৃষ্ট। মালদহে রেশম-গুটি বা পলুর চাষ হয়। এ চাষ আজকের নয়—অতি প্রাচীনকালের। মালদহের রেশম উৎপাদন কেন্দ্র বহুদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল।

পলু বা রেশমগুটির চাষ করা হয় অতি সাবধানে। পলুদের দিনে রাতে তিন-চারবার তুঁতেপাতা খেতে দিতে হয়। তুঁতেপাতা

ছাড়া আর কিছুই পলুর মুখে রোচে না। ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয় পলুদের। যাতে মাছি এসে বিরক্ত না করে সেজন্য দরজা-জানালায় লাগানো হয় তারের জাল। ঠিকমত যত্ন করতে পারলে তবেই পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিনের পলু গুটি তৈরি করে।

বসনী গুটি পাকিয়ে বেচে দেয় কাটানীর কাছে। কাটাইদার গুটি সিদ্ধ করে রেশমের খাই খুলে সুতো বের করে। একটি পলু থেকে এক থেকে দেড় গ্রেন রেশম পাওয়া যায়। তা থেকে ২৫০।৩০০ গজ সুতো পাওয়া যায়। অতি দীর্ঘকাল ধরে বাংলার কৈবর্ত, বৈষ্ণব, মাল, বাগদী ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের লোক রেশম-শিল্পের সঙ্গে জড়িত। এঁদের শিক্ষা অল্প কিন্তু রঙের চেতনা ও ডিজাইনের জ্ঞান অত্যন্ত বেশী। মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর বাংলার রেশম শিল্পকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

এমন একদিন ছিল, যেদিন বাংলার মসলিন, বালুচর ও জামদানীর খ্যাতি ছিল সারা পৃথিবীময়। এখন আর সেদিন নেই। তবুও নকৃসি তাঁতবস্ত্র বাংলার সবচেয়ে বড় কুটির শিল্প।

'বাংলার মসলীন, বোগদাদ, রোম, চীন
কাঞ্চন মূল্যেই কিনতেন একদিন।'

মিশরের মমির গায়ে জড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে বাংলার ঢাকাই মসলিন। নবম শতাব্দীতে আরবীয় পর্যটক সুলেমান এসেছিলেন ভারতে। তাঁর বিবরণীতে তিনি লিখে গেছেন যে, কুড়ি হাত লম্বা দুই হাত চওড়া একখানা মসলিন একটা আংটির ভেতর দিয়ে অনায়াসে টেনে বের করা যায়।

১২৯০ সালে মার্কো পোলো, ১৫৮৩ সালে র‍্যালফ ফিন্‌চ, এমন

কি আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল—সবার মুখেই আমরা শুনেছি বাংলার মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা।

বাংলার বিখ্যাত মসলিনের ওজন শুনলে চমকে উঠতে হয়। ১৪০ থেকে ১৬০ হাত লম্বা একখানা মসলিনের ওজন মাত্র ৪ তোলা। মসলিন তৈরির আধ সের সুতো খুলে দেখা গিয়েছিল যে, সে সুতো ২৫০ মাইলের মত লম্বা।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৬৬৬ সাল থেকে বাংলার মসলিন বিদেশে চালান যেতো। ইংলণ্ডের বাজারে সেকালে মসলিনের চাহিদা ছিল অত্যন্ত বেশী। কিন্তু আজ!—আজ বাংলার এই শিল্প গেছে লুপ্ত হয়ে।

বাংলার মসলিন প্রধানত ঢাকায় তৈরি হতো। তাই তার নাম ছিল ঢাকাই মসলিন।

ফুলকাটা বুটিদার মসলিনের নাম ছিল জামদানী। বাংলার আর এক বিখ্যাত বস্ত্র হচ্ছে বালুচর। বালুচরের বৈশিষ্ট্য তাঁর আঁচলায়। এর জমিতে থাকতো নানা রঙের ছবির মত সূক্ষ্ম কাজ। বালুচরের আসল জায়গা হলো মুর্শিদাবাদ। বালুচর শাড়ি তৈরি হতো রেশমে। এ শাড়ির কাজ জানা শিল্পী এখন অতি অল্পই আছেন মুর্শিদাবাদে।

১৩। **অন্যান্য শিল্প:** শ্রীনিকেতনে ভাল সতরঞ্চ তৈরি হয়। বারাসতের কাছে মধ্যমগ্রামে সুদৃশ্য সুজনী তৈরি হয়। দার্জিলিং জেলায় বেশ ভাল কয়েকজন গালিচা শিল্পী আছেন। তাঁদের তৈরি গালিচা বেশ উন্নত ধরনের। দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া বস্তিতে বহুসংখ্যক কারুশিল্পীর বাস। এঁদের কেউ কাঠের কাজ করেন, কেউ পেতলের পেটাই কাজ করেন, কেউ করেন তারের কাজ ও জড়োয়ার কাজ। এঁরা শিল্পে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলার সাধক

সাধনার পীঠস্থান বাংলা। যুগে যুগে এ দেশে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক সাধক পুরুষের। এই সব সাধক পুরুষেরা বিশ্বমনাঃ। ভালোর দিকে মানুষের মনকে আকর্ষণ করা তাঁদের প্রতিভার ধর্ম। ত্যাগ তাঁদের আদর্শ। দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ হন না। তাঁরা বিশিষ্ট নায়ক, জাগরণের পুরোহিত, লোকোত্তর পুরুষ। তাঁদের শিক্ষায় থাকে প্রগাঢ় জীবনবোধ, অকপট আদর্শানুরাগ, স্বচ্ছ সরলতা, অকুণ্ঠ নিষ্ঠা এবং গভীর সত্যপ্রীতি। তাঁদের বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে জগৎময় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মনকে উচ্চ আদর্শের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের প্রাণে নিত্য প্রেরণা যোগায়। তাঁদের শিক্ষা স্বার্থ বিসর্জনের প্ররোচনা দেয়। মানুষকে প্রীতির-সূত্রে আবদ্ধ করে। মানুষের আত্মাকে জাগায়।

সাধক পুরুষেরা মানুষকে ঠিক পথে পারিচালিত করেন। মানুষের অজ্ঞানতা দূর করে, জীবনের পূর্ণতা লাভের সাহায্য করেন। ভালবাসা দ্বারা তাঁরা মানুষের হৃদয় জয় করেন। অভয়মন্ত্রের সাধকদের ভাবধারায় মানুষের বিভ্রান্ত মন আদর্শ খুঁজে পায়। তাই তাঁরা সবাই আমাদের নমস্য।

বাংলাকে জানতে হলে তাই বাংলার সাধক পুরুষদেরও জানা দরকার। কিন্তু সকল বাঙ্গালী সাধকের পরিচয় দেবার অবকাশ এ গ্রন্থে নেই। তাই বাংলার কয়েকজন খ্যাতনামা সাধকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

১। **শ্রীচৈতন্যদেবঃ** ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে এক সাধারণ ব্রাহ্মণবংশে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তাঁর বাল্য নাম ছিল বিশ্বম্ভর। তাঁর পিতার নাম পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র আর মাতার নাম শচীদেবী।

বিশ্বম্ভর বাল্যকালে লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। তিনি খুব অল্প বয়সেই পণ্ডিতরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপে একটি টোল খুলে বসেন।

বিশ্বম্ভরের দুবার বিয়ে হয়। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী সর্পাঘাতে মারা যান। তখন মায়ের একান্ত অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করেন, কিন্তু সংসারে আর মন বসে না।

পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একবার তিনি গয়ায় যান। সেখানে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। দীক্ষা গ্রহণের পর নবদ্বীপে ফিরে এসে তিনি টোল তুলে দেন। দিনরাত হরিনাম সংকীর্তন করে কাটাতে থাকেন। নবদ্বীপের পথে পথে নাম-কীর্তন করে বেড়াতে থাকেন। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বম্ভর এখন গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম প্রচারে প্রধান সহায়ক নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য ও হরিদাস ঠাকুর। হরিদাস ঠাকুর জাতিতে মুসলমান।



শ্রীচৈতন্যদেব

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবৎ প্রেম এতই প্রবল হয় যে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। নাম নেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

শ্রীচৈতন্যদেব নানা তীর্থ ভ্রমণ করে অবশেষে পুরীতে গিয়ে বাস করতে থাকেন। পদব্রজে দীর্ঘকাল তীর্থ ভ্রমণের সময় তাঁর প্রেমধর্ম দিকে দিকে প্রচারিত হয়। তাঁর প্রেমোন্মত্ত ভগবৎ জীবন ও দিব্য আচরণে বহু লোক আকৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব কোন নতুন ধর্মমত প্রচার করেন নি। তিনি প্রচার করেছিলেন—জীবে প্রেম, ভগবানে ভক্তি ও নাম-কীর্তন। তপস্যা নয়, কৃচ্ছ সাধন নয়, নানা উপচারে পূজার্চনা নয়—শুধু নাম-কীর্তন। তাতেই ভক্তি—তাতেই সিদ্ধি।

১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেব দেহত্যাগ করেন।

২। **রামপ্রসাদ** ঃ বাংলার এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য বংশে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের জন্ম হয়। জন্মস্থান হালিশহর। তাঁর পিতা রামরাম সেন ও মাতা সরস্বতী দেবী।

ছোটবেলা থেকেই রামপ্রসাদ ছিলেন মেধাবী। তিনি কাব্য ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফার্সী এবং উর্দু ভাষাও আয়ত্ত করেন। পৈতৃক পেশা ছিল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। সে পেশায় কিন্তু রামপ্রসাদের মন ছিল না। সর্বদা কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব। তাই দেখে পিতামাতা ছেলের বিয়ে দিলেন। তবুও সেই উদাসীন ভাবটা গেল না।

তবে ঘটনাচক্রে রামপ্রসাদকে সংসারে মন দিতে হলো। পিতার মৃত্যুর পর সংসার চলতো না। তাই প্রয়োজনের তাগিদে তাঁকে চাকরির খোঁজে বেরুতে হলো। গরাণহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্র। তাঁরই জমিদারি সেরেস্তায় রামপ্রসাদ মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে হিসাব-রক্ষকের কাজ পেলেন। সংসারের অভাব দূর হলো কিন্তু মনের অভাব দূর হলো না। তাই তিনি আপন মনে গান রচনা

করে মাতৃ আরাধনা চালাতে লাগলেন। তিনি ছিলেন কালী মায়ের ভক্ত। অল্প দিনের মধ্যেই জমিদারের হিসাবেরখাতা কালী-কীর্তনে ভরে গেল। খাতায় টাকার অঙ্কে কিছু জমা পড়লো না।

জমিদারের কাছে রামপ্রসাদের নামে নালিশ গেল। তদন্ত হলো। তদন্তে জানা গেল যে সব অভিযোগই সত্য। কিন্তু রামপ্রসাদ রচিত গান শুনে জমিদার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁকে চাকুরিতে তো বহাল রাখলেনই উপরন্তু আদেশ দিলেন যথেচ্ছ মাতৃ-সঙ্গীত রচনা করতে।

রামপ্রসাদের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা দূর হলো। তিনি তখন নিবিষ্ট চিত্তে মায়ের নামে গান রচনা করতে লাগলেন। সুর আরোপ করে সে সব গান গাইতে লাগলেন। সে গান 'রামপ্রসাদী গান' নামে খ্যাত হলো।

রামপ্রসাদ তারপর তাঁর জন্মস্থান হালিশহরে এক নির্জন স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে তান্ত্রিক সাধনায় রত হলেন। বিভিন্ন সময়ে মায়ের দর্শন লাভ করে তিনি হলেন সিদ্ধ পুরুষ। তিনি অন্তরে-বাইরে নিরন্তর মায়ের উপস্থিতি এবং স্নেহ অনুভব করতে লাগলেন।

শক্তি মন্ত্রের হোতা, সিদ্ধযোগী ও ভক্ত কবি রামপ্রসাদ আশী বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩। বামাক্ষেপা : ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সাধক বামাক্ষেপা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল রাজকুমারী দেবী।

বামাক্ষেপার আসল নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই বামাচরণের সব বিষয়েই যেন আলগা-আলগা ভাব। তাই

দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'পাগলা ক্ষেপা'। পাগলা ক্ষেপার এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল ছেলেবেলায়। রাত্রে চুপি চুপি প্রতিবেশীদের মন্দিরের বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে শ্মশানে গিয়ে প্রাণ ভরে পূজা করতেন।

বেশী লেখাপড়া শিখবার সুযোগ হয় নি বামাচরণের! তবে মায়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে তিনি রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়তে শিখেছিলেন। শেখেননি শুধু সাংসারিক কোন কাজ করতে। ফুল-বেলপাতা সংগ্রহ করে 'মা তারা' বলে মায়ের পাদপদ্মে তিনি যখন অঞ্জলি দিতেন তখন দেহে কোন হুঁশ থাকতো না। তাঁর ভাব দেখে মনে হতো—মায়ের পূজা ও সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত। সেইটাই সত্য হলো।

তারাপীঠে তখনকার দিনে কৈলাসপতি বাবা নামে এক বড় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। একদিন বামাচরণ দ্বারকা নদী সাঁতারে তারাপীঠে কৈলাসপতি বাবার কাছে উপস্থিত হলেন। কৈলাসপতি বাবার কাছে তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নিলেন। তারপর বামাক্ষেপার তন্ত্র সাধনা আরম্ভ হলো। শীত-গ্রীষ্ম রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মায়ের ধ্যানে তিনি ডুবে গেলেন। বহু প্রলোভন এলো তাঁর পতন ঘটাবার। কিন্তু মায়ের কৃপায় সেই সব কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন।

কৈলাসপতি বাবা লক্ষ্য করলেন যে, শিষ্য বামাক্ষেপার যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। তিনি তাই বামাক্ষেপার উপর তারাপীঠের পীঠত্ব রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে বিদায় নিলেন। গুরুর আশীর্বাদে বামাক্ষেপা পীঠের মাহাত্ম্য প্রচারে কৃতকার্য হলেন।

বামাক্ষেপা তখন কৌলাচার, দিব্যাচার প্রভৃতিতে সিদ্ধ হয়েছেন —তিনি আর কোন বাইরের আচারের অধীন নন। কখনও তিনি

রাস্তার কুকুরের সঙ্গে আহার করেন। কখনও বা মন্দির সংলগ্ন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করেন। তাঁর কাছে আচার-অনাচার সব তখন এক। দিনরাত তখন তিনি মাতৃচিন্তায় মগ্ন।

বামাক্ষেপার অলৌকিক শক্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূর দেশ থেকে বহু লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। কেউ এলো কঠিন রোগ মুক্তির আশায়। কেউ এলো আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ-নির্দেশের আশায়। সবাই খুশি মনে ফিরে গেল এই সাধক পুরুষের আশীর্বাদ নিয়ে।

বামাক্ষেপা বলতেন যেঃ যখন কিছু জানবার প্রয়োজন হয় তখন মা আমাকে সব জানিয়ে দেন। তিনি সব মায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁকে কিছুই ভাবতে হয় না। মা তার সব ভাবনা ভাবেন। তাঁকে যন্ত্র-স্বরূপ ব্যবহার করে মা জগতের কল্যাণ সাধন করেন।

সাধক বামাক্ষেপা ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। **শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঃ** বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও মাতা চন্দ্রমণি দেবী। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল গদাধর। পিতার মৃত্যুর পর গদাধর কলকাতায় তাঁর দাদার কাছে চলে আসেন টোলে পড়বার জন্য। কিন্তু পড়াশুনা করে তাঁর বিদ্বান হওয়ার সুযোগ হয়নি জীবনে।

তখন রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির স্থাপন করেছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণও কেনারাম ভট্টের কাছে শাক্ত মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারীরূপে তাঁর সাধক জীবন আরম্ভ করলেন। তিনি ছিলেন সাকার উপাসক—কালী

মূর্তির উপাসক। কালী পূজা করতে করতে তাঁর মনে ভগবৎ প্রেমের উদয় হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন ঃ মা কালীকে যদি আপনার করে না পাই, তবে এত পূজা, এত সেবার ফল কি! ভেবেই ক্ষান্ত রইলেন না। আহার-নিদ্রা ভুলে তিনি মায়ের ধ্যান করতে লাগলেন। ভগবান আর থাকতে না পেরে মায়ের রূপ ধরে তাঁকে দেখা দিলেন।



শ্রীরামকৃষ্ণ

তারপর ১২৬২ সাল থেকে ১২৭৩ সাল পর্যন্ত—বারো বছর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা করলেন। কখনও শাক্ত মতে সাধনা, কখনও বৈষ্ণব মতে সাধনা। আবার যিশু ও মহম্মদের মতে সাধনাও করলেন। এইসব সাধনার ফলে তিনি বুঝলেন যে 'যত মত তত পথ'। যাবার জায়গা কিন্তু এক—সেখানে লোকে যায় নানা পথে। কাজেই পথ নিয়ে ঝগড়া করা বৃথা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন। সরল কথ্য ভাষায় সাধারণ লোককে ধর্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা বিরাজেন সর্বঘটে' জেনেও ইষ্টমূর্তি উপাসনার দিকে ঝোঁক দেখিয়েছেন। অদ্বৈতের চেয়ে দ্বৈতের, জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে বেশীক্ষণ নিঃসঙ্গ থাকতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন লীলার আনন্দ, রসের আস্বাদন।

ভগবান ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ আর কিছু জানতেন না। ভগবান যা করাতেন তিনি তাই করতেন। কারুর দুঃখ তিনি সইতে পারতেন না। সকল জীবকে তিনি নিজের ভেতর দেখতে পেতেন। দুঃখীর দুঃখে তিনি ব্যথিত হতেন। আবার খুসি হতেন তাদের সুখে।

প্রেমের ঠাকুর, দয়ার অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরদুঃখকাতরতাই 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর মূল ভিত্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ সংসারে থেকে সব কাজ করো কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়লে অনর্থ ঘটবে। ভক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে সর্বদা তাঁর পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাও।

ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়। কিন্তু এর জন্যেও ঈশ্বরের কৃপা চাই। এ কৃপা কি সহজে হয়! এর জন্যে অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হয়। আমি কর্তা—এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। 'আমার' বা 'আমিত্ব' দূর হলে তবেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল রামকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করেন।

৫। **মোবারক গাজী বা পীর মোবারক ঃ** মোবারক গাজী মধ্য যুগে বাংলার একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল শায়েস্তা খাঁর আমল। ঐ সময় মোবারক গাজী জীবিত ছিলেন। তাঁর পীঠস্থান ছিল ঘুটিয়ারি গ্রাম। বর্তমান ইষ্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখায় পড়ে ঘুটিয়ারি গ্রাম। স্টেশনের নাম ঘুটিয়ারি শরীফ।

পীর মোবারক ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাঁর গ্রামাঞ্চলে পরপর কয়েকবার অনাবৃষ্টি হয়। ফলে বহু লোক ও গবাদি পশু মারা যায়। তখন পীর সাহেব বৃষ্টি আনবার জন্যে কঠোর সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে তাঁর গুরুর কাছে চলে গিয়ে সাহায্য চান। ফিরতে তাঁর দেরী হয়। তখন তাঁর শিষ্যদের ধারণা হয় যে গুরু বুঝি দেহত্যাগ করেছেন। এই ভেবে তাঁরা পীরের দেহ সমাধিস্থ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই পীরের সাধনার

ফল স্বরূপ প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। ভক্তেরা তখন বুঝতে পারেন যে পীরের মৃত্যু হয়নি। তিনি সূক্ষ্মদেহে সেখানেই বিরাজ করছেন।

পীর মোবারক যে শুধু মুসলমানদেরই পূজনীয় ছিলেন তা নয় তাঁর অনেক হিন্দু শিষ্য-সেবকও ছিল। তাঁর স্মৃতিপূত ঘুটিয়ারি শরীফ মুসলমানদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

৬। **স্বামী বিবেকানন্দ**ঃ জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী। জন্মস্থান—কলকাতা। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। মা নবজাত শিশুর নাম রাখলেন বীরেশ্বর—ডাকতেন 'বিলে' বলে। কিন্তু অন্নপ্রাশনের সময় নাম বদল করা হলো। নতুন নাম রাখা হলো 'নরেন্দ্রনাথ'।

পাঠ্যাবস্থাতেই নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধর্মভাবের প্রাবল্য দেখা দেয়। সত্য ও ঈশ্বর লাভের জন্য হৃদয় তাঁর অশান্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। যতই দিন যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। শেষে নরেন্দ্রনাথ পরমহংদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন।


স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে সাক্ষাৎ প্রেরণা লাভ করে সাধক হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। গুরুর মত তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন যে জগৎ ও জীব—সবই ব্রহ্ম। কিন্তু বিবেকানন্দ ব্রহ্মকে আশ্রয় করে জগৎ ও জীবকে উপেক্ষা করেন নি

বরঞ্চ জীবই ব্রহ্ম বলে নর-কে তিনি নারায়ণ করে তুলেছিলেন। জীবপ্রেমকেই ঈশ্বরপ্রেম, জীব সেবাকেই ঈশ্বর সেবা বলে প্রচার করে ছিলেন। সর্বত্র এক অখণ্ড ব্রহ্মানুভূতির ফলে সর্বভূতকে বিবেকানন্দ নিজের মধ্যে দেখতেন। তিনি ধর্মোপদেশক সেজে মানুষকে কৃপা করার বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে শুধু নর-নারায়ণের সেবা করবার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই পরলোকগমন করেন।

৭। **শ্রীঅরবিন্দ ঃ** ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে কলকাতায় অরবিন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। মাত্র সাত বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ ইংলণ্ডে যান শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরে এসে অরবিন্দ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে ইংরেজী ভাষায় অধ্যাপনা করতে থাকেন।

এই সময়ে দেশের দুর্দশা দেখে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তারপরই শুরু হয় শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন। রাজনৈতিক জীবনের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে বেশ দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

এরপর শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করে অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য পণ্ডিচেরী যান। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যোগ-সাধনা করতে থাকেন।

তান্ত্রিক-সাধনা ও শক্তি-সাধনার একটি সূক্ষ্ম বিকাশ আমরা দেখতে পাই শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মধ্যে। তিনি যে সামগ্রিক অখণ্ড যোগ-সাধনার কথা প্রচার করেছেন, তন্ত্র-সাধনাই তার ভিত্তি ভূমি

তিনি যে জীবনের আদর্শ প্রচার করে গেছেন তা সামগ্রিক এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তনের সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল কথা হলো—মাকে ভেতরে বসিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে দিতে হয়। জীবনের মধ্যে মায়ের উপস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলতে হলে দেহ-মন-আত্মা সহ সমস্ত সত্তার মন্দিরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে তুলতে হয়। অরবিন্দের মতে—সাধনা তো ঠিক মানুষ করে না, মানুষের মধ্যে দিয়ে সাধনা করেন মা নিজে। মানুষের মুখ্য কাজ হলো মা যাতে মানুষের মাধ্যমে বিনা বাধায় কাজ করতে পারেন তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা। মা সর্বদা ভেতরে বসে কাজ করতে কোন বাধা না পান—সাধকের করণীয় হলো শুধু সেইটুকু।



শ্রীঅরবিন্দ

অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অরবিন্দের গীতার বাণীই প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন—মানুষ কর্মের দ্বারা যা লাভ করে, জ্ঞানের দ্বারাই তা প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ই মানুষকে শান্তি দেবে। জগতে মৈত্রী ও প্রেমের বন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। জগতে অহং সত্তাকে প্রাধান্য দিলে অশান্তি ও দুঃখ অনিবার্যরূপে দেখা দেবে। বিশ্বের কল্যাণ সাধনায় অহং সত্তাকে লুপ্ত করে আত্মজ্ঞান লাভ করলেই শান্তিলাভ সহজ হয়ে পড়বে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের মহানির্বাণ হয়।

বাংলার সংস্কৃতি

যে কৃতির বলে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকেও ছাড়িয়া উঠে মানুষ হিসাবে তারপরিচয়ের স্বাক্ষর দিচ্ছে তাই মানুষের সংস্কৃতি। একটি জাতির মানস চর্চা, তার ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার বাস্তব রূপায়ণই তার সংস্কৃতির পরিচয়। তাই সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি একটি জাতির অন্তরঙ্গ প্রতিভা ও চিৎ-প্রকর্ষের বহিঃপ্রকাশ। কোনজাতির আচার পদ্ধতি, শিক্ষা-দীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকপ্রভাব—এ সবের সমন্বয়ে গড়া এক অপূর্ব মনোভাবই হচ্ছে তার সংস্কৃতি।

বাংলার প্রাকৃতিক পটভূমিকা ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য, সমতলভূমিত্ব ওনদীবহুলতা—বাংলাকে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তা ছাড়া বাঙ্গালী বিশেষ একটা মানবগোষ্ঠীর অবিমিশ্র বংশধর নয়। আর্যরা এদেশে যখন আসেনি তখন বাংলায় বাস করত অস্ট্রিক জাতি। সে জাতির ছিল নিজস্ব একটা সংস্কৃতি। তারপর এখানে একে একে আসে মঙ্গোলীয়, ভোট, চীন ও দ্রাবিড় জাতি। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে আর্য সংস্কৃতি বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে মেশে। বাংলার জাতীয় জীবনধারায় তাই বহু গোষ্ঠী ও বহু সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে। এ প্রভাব আজকের নয়—অতি প্রাচীন কালের। পরবর্তী কালেও ইসলামিক ও খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতি প্রভাবান্বিত হয়।

মহামতি গোখলে একদিন বলেছিলেন ঃ বাংলা দেশ আজ যা ভাবে ভারত ভাবে তা কাল।—বস্তুত ভারতে বাঙ্গালীই ছিল নব নব চিন্তাধারার প্রবর্তক। বাঙ্গালীই ছিল ভারতের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যুগে যুগে বাংলার বুকের উপর দিয়ে কত পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি সেই পরিবর্তনের মধ্যেও আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়েছিল। বাংলার শ্যামল পরিবেশ ও কমনীয়তা বাংলাকে কেবল সুষমামণ্ডিত করেই তোলে নি—বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। আর বাঙ্গালী সেই বিরাট ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। আচার-ব্যবহারে, ভাষায় পোষাকে—সব তাতেই বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের ঘূর্ণীপাকে আজ সে স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অটুট নেই।

বাংলার আদিম সংস্কৃতি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ও কৃষি নির্ভর। ছোট ছোট গ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন অতীতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। বাংলার সেই গ্রামগুলি ছিল অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। গাছপালা ও তার ছায়ায় ঘেরা গ্রাম্য কুটিরগুলি এককালে বাঙালীর জীবনকে স্বপ্নমধুর করে তুলতো। বাংলার সেই ছায়ায় ঘেরা কুটিরগুলি, মাটির ঘরের সেই পরিচ্ছন্ন শ্রী ও খড়ের আট-চালাগুলি বাঙ্গালীর সৌন্দর্যপ্রীতি ও শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

বাংলার পল্লী সেদিনও ছিল আম, জাম ও কাঁঠাল গাছের দ্বারা ছায়াশীতল। সেখানকার কুঁড়ে ঘর গোময়লিপ্ত। ঘরের আঙিনা পরিচ্ছন্ন। সেদিন পর্যন্ত বাংলার মন্দির ছিল কারুকার্যমণ্ডিত। সেখানে দেবতারা নিত্য ভোগ পেতেন। প্রসাদ পাওয়ার জন্য মন্দিরে ছেলে-বুড়ো জড়ো হতো। অতিথি সেখান থেকে ফিরতো না। গ্রামের চিত্রকর যে সব ছবি আঁকতেন তার সৌন্দর্য আজও

লোকের প্রশংসা পায়। আমাদেরই 'সুপটু পটুয়া'র আঁকা লীলায়িত পট কেবল অজন্তায় নয়—বাঙ্গালীর ঘরেও শোভা পেত। এই পট-



আলপনা

গুলি শিল্পের এক বিশিষ্ট অবদান। বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা যে আলপনা দেয় তার মধ্যেও পাওয়া যায় বাঙ্গালীর শিল্পীমনের পরিচয়।

সেকালে পল্লীর হালুইকরের হাতে মিছরির খেলনা, নারকেলের সন্দেশের মঠ, গৃহ, জীবজন্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ছবির মত সাজানো থাকতো। সেই নারকেলের শাঁস দিয়ে এমন ময়ুর গড়া হতো যার ডানা, পাখা ও লেজে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র রং খেলা করত। মৌর্য, গুপ্ত ও পাল রাজত্বকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত প্রণালী বাংলার গ্রামবাসীরা সেকালে আয়ত্ব করেছিল।

আজও বাংলার মৃৎশিল্প বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। মাটির পাত্র ও মূর্তি নির্মাণে বাঙ্গালী শিল্পীর সমকক্ষ আর কে আছে! বয়ন শিল্পে ঢাকাই মসলিন জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। সূচী শিল্প ও শঙ্খ শিল্পেও বাঙ্গালীর শিল্প প্রতিভা আজও অক্ষয় হয়ে আছে। এককালে বাংলার কুসুম শিল্প ছিল বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। যুবরাজ মহম্মদ একদা তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন: 'কি আর মণিমুক্তা চুনি

পান্নার লোভ দেখাও পিতঃ, বাংলার কুসুমাভারণ দিল্লীর জড়োয়া অলংকারকেও হেলায় পরাজিত করে। এমনটি তুমি দেখনি।'

নৌ-শিল্পেও বাংলার ছিল অপূর্ব দক্ষতা। বাংলার ষাট বৈঠার ছিপে চড়ে মীরকাশিম একরাত্রে মুঙ্গের থেকে গোদাগাড়ি পাড়ি দিয়েছিলেন।

এই বাংলাতেই কীর্তন গানের উদ্ভব ঘটেছে। পাঁচালী গান। আগমনী গান, বিজয়া ও বাউল গান আজও লোক-সঙ্গীতে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিচ্ছে। বাংলার পল্লীর রাইবেঁশে, বাউল, জারি, দশাবতার প্রভৃতি নাচের বিজ্ঞানানুগ অঙ্গভঙ্গী ও সৌষ্ঠব পাশ্চাত্ত্য নৃত্যশিল্পীদেরও মুগ্ধ করেছে। বাংলার গ্রামের টোল থেকেই পণ্ডিতেরা সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে জগদ্গুরু উপাধি লাভ করেছেন। বাঙ্গালীর জীবনে আছে 'বারমাসে তের পার্বণ'। এই সব পূজা-পার্বণ ও সামাজিক উৎসবের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী তার জীবনকে আনন্দমধুর করে রেখেছে। প্রতিটি উৎসবের মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছে মিলনের সুর। প্রতিটি উৎসবই বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ সাধন করছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী যে গৌরবময় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী ছিল, তার প্রভাব সুদূর যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। আজও সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বঙ্গ সংস্কৃতির পরিচয় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

বাংলার আদিম লোকায়ত সংস্কৃতি ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষির আনুষঙ্গিকরূপে ছিল ছোট ছোট কুটির ও কারুশিল্প। তাই বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি গ্রাম্য কৃষি শিল্প ও গ্রাম্য ভৌগোলিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই গ্রাম বাংলার দেব-দেবী, আধ্যাত্মিক জীবনের

চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক উৎসব—সবই কৃষি-জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে জড়িত ছিল।

এককালে বাংলার শিল্পকেন্দ্রগুলি ছিল বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থান ছিল ধর্ম ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। এখানকার বিখ্যাত পণ্ডিতেরা জ্ঞানদান করে আপন আপন মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যও বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার এক অপূর্ব নিদর্শন। যে বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাব। সেই চর্যাপদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। অনেক পরিবর্তন ও অনেক নতুন ভাবধারা বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত ও পুষ্ট করেছে।

বাংলার চিন্তাধারাকে যুগে যুগে মনীষিবৃন্দ নতুনতর আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। বাঙ্গালী আপনার জীবনকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখেন—বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়েছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগ-প্রবর্তক মনীষীরা। বাংলার চিন্তাধারায় ও বাংলার ধর্মনৈতিক জীবনে নতুন আলোকপাত করেছেন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হলে বাঙ্গালীই প্রথম সেই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন আদর্শের সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ কিন্তু কর্মক্ষম ও সহিষ্ণু। বাঙ্গালী কোমল কিন্তু কঠোর। বাঙ্গালী ভাব-জীবনের উপাস্য দেবতা বংশীধারী মাধুর্যময় কৃষ্ণ। কিন্তু ধর্ম-জীবনের উপাস্য দেবী

ভয়াল সুন্দরী কালী। বাঙ্গালী প্রেমধর্মের সাধক কিন্তু আত্মবলের বিশ্বাসী এবং নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার অধিকারী।

বাঙ্গালীর জীবনে বহু সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে সত্যি। পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে বিপর্যয় এনেছে সত্যি। কিন্তু বাঙ্গালী তার লোকায়ত ভাবধারাকে আজও বিসর্জন দেয়নি। বাঙ্গালী তার সংস্কৃতি সাধনার দীপটিকে আজও সযত্নে জ্বালিয়ে রেখেছে। আজও ধর্ম-কর্ম উৎসবে যে পান, কলা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় তা প্রাচীন অস্ট্রিক সভ্যতার নিদর্শন। বাঙ্গালীর উলুধ্বনি, স্ত্রী-আচার এবং মৎস্য প্রীতির মধ্যে দাক্ষিণাত্যের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় তন্ত্রের প্রাধান্য চীনা প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। বাঙ্গালীর ধর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম। ইংরেজরা এদেশে আসার পর বাঙ্গালীর ভাবজীবনে নতুন এক পরিবর্তন এসে দেখা দেয়। বাঙ্গালীয় অন্তরে জেগে ওঠে মানব হিতবাদ—মানবতাবোধ।

আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর সেই সহজ, সরল, সাবলীল জীবনযাত্রা আবর্তসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত বীভৎসতা বাংলার সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করে তুলছে। আজ বাংলার জীবনস্রোত পদে পদে বাধা পাচ্ছে। পরানুকরণের ক্লেদ জীর্ণতায় বাংলার জীবন-প্রবাহ অবরুদ্ধ হচ্ছে। আজ বাংলার গ্রামের নদীতে বাইচ খেলা হয় না। বারোয়ারীতলার গ্রাম্য দেবতার আসনের পাশে বাঁধা থাকে গরু। গ্রামের নাট-মন্দিরের আটচালা আজ ভগ্নপ্রায়। গ্রামের যুবকেরা আজ ভাটিয়ালী গানের সুর ভুলে হালকা গানের আনন্দ উপভোগ করে। আজ বাঙ্গালী ধুতি ছেড়ে

কোট-প্যাণ্ট পরছে। গলায় পৈতা ও কণ্ঠির বদলে পরছে নেকটাই। করজোড়ের বদলে করমর্দন করছে। আজ বাংলার সংস্কৃতি হয়ে পড়ছে পুরোপুরি নাগরকেন্দ্রিক। কল-কারখানার চিমনী হতে উদ্গারিত ধোঁয়া আজ বাংলার উদার আকাশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। কারখানার চাকা আজ বাংলার মাঠ-ঘাট জনপদকে গ্রাস করে শ্যামল প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ প্রয়োজন হয়েছে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের। নবীনকে অস্বীকার করা চলবে না। সেটা উচিতও নয়। আজ কলের বাঁশী বাজবেই। সেক্ষেত্রে বাঁশের বাঁশীকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না। আজ প্রয়োজন হয়েছে বৃহদায়তন শিল্প। কুটির শিল্প এবং কৃষির মধ্যে একটা সমন্বয়ের রূপ সৃষ্টি করা। লোকায়ত গ্রাম-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু ও সমীচীন মিলনের প্রয়োজন আছে আজ। আর তার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে বাংলার ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি। আজ বাঙ্গালীকে অতীতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানকে আপনার করে নিতে হবে। বাইরের আমদানী করা স্থাপত্য, ভাস্কর্যকে আপন মনীষার সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। তবেই যুগ পরিবর্তনের মধ্যেও বাঙালী তার আপন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে চিরকাল রক্ষা করতে পারবে।





সার্থক জনম আমার,
(আমি) জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধন-রতন
আছে কিনা রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে
মুছব নয়ন শেষে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নির্ঘণ্ট

অক্ষয়কুমার দত্ত ৫১
অগষ্ট বিপ্লব ২৩
অঘোরী বাবা ৭৪
অজন্তা ১৫১
অজয় নদ ৬
অতীশ দীপঙ্কর ৫৯
অতুলপ্রসাদ সেন ৩৪, ৯৬
অথর্ববেদ ৩৭
অনন্তহরি মিত্র ২১
অনার্য জাতি ১২, ১৩, ১৪
অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭
অনুশীলন সমিতি ১৭-২০
অপভ্রংশ সাহিত্য ৩৭
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৯
অরবিন্দ ১৮-১৯, ১৫৮-৫৯
অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ৩৮
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৭
আইন অমান্য আন্দোলন ২১
আউল ৮৩
আজাদ হিন্দ ফৌজ ২৩, ২৪
আটচালা মন্দির ১০৯
আনন্দমঠ ৫৪
আবহতত্ত্ব বীক্ষণাগার ৬৫
আরণ্যক ১৩
আলপনা ১৫১
আর্য জাতি ১১, ১২, ১৩, ১৪
আলালের ঘরের দুলাল ৫১
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৬০, ৬১, ৬৩
ঈদ-উজ-জোহা ১২৫
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৬
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট ৬৪
ইন্দ্র ৭২
ইমফল ২৪
ইমাম বাড়া ৭৭
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৪৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫০, ১৫৩
উদ্ভিদতত্ত্ব সমীক্ষা ৬৫
উপনিষদ ১৩, ৩৬
উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬
উল্লাসকর দত্ত ১৯
ঋগ্বেদ ১২, ৩৬, ৩৭
একেশ্বর মন্দির ১০৬
এশিয়াটিক সোসাইটি ৬২
ওড়িয়া ভাষা ৩৯
ওয়ার্ড, উইলিয়ম ৪৯
ঔরঙ্গজেব ২৭
কাংস শিল্প ১৪৫
কথা ও কাহিনী ৫৭
কপিল মুনি ৭২
কলকাতা কর্পোরেশন ৩৩
কবি গান ৯৪
কপিলাবস্তু ১২২
কল্পনা দত্ত ২২
কাঠি নাচ ৯৮
কর্কট ক্রান্তি রেখা ৬
কমলাকান্ত ৪৮
কাকদ্বীপ ৭৮
কাচ নৃত্য ১০০
কাজী নজরুল ইসলাম ৯৬
কাবুলিওয়ালা ৫৮
কানাই দত্ত ১৯
কার্জন, লর্ড ১৬
কালীকাচ নৃত্য ৯৮, ১০০
কালীক্ষেত্র ২৬
কালীঘাট ২৬, ৬৬
কালীনৃত্য ১০০
কালীপূজা ১৪
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫১
কাশীনাথ ৫৫
কাশীরাম ৪৬
কিংসফোর্ড ১৮
কৃত্তিবাস ৪৬
কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৭
কৃষ্ণকুমারী ৫৩
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ৪৬
কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার ৬৫
কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার ৬৫
কেরী, উইলিয়ম ৪৯
কোল ১১, ১২, ১৩, ১৪

কোহিনূর ২৪
ক্ষিতিমোহন সেন ৮৪, ৮৫
ক্ষুদিরাম বসু ১৮, ১৯
খনিজ সম্পদ ৮
খিদিরপুর ডক ৩৩
গঙ্গা ৩, ৪, ৫
গজদন্ত শিল্প ১৩৮
গয়া কংগ্রেস ২১
গম্ভীরা গান ৯১
গাজন ৭০, ৮৭, ৯০
গাজন নৃত্য ৯৭-৯৮
গান্ধী ২৮
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৫৩
গীতাঞ্জলি ৫৭
গুড ফ্রাইডে ১২৭
গুরুপ্রসাদ সিংহ ৬৩
গোবিন্দ দাস ৫৮
গোবিন্দপুর ২৬, ২৭
গোরা ৫৮
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ২১, ২২
চণ্ডীদাস ৪৮
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামণ ৬৪
চমরীছন্ন নৃত্য ১০০
চর্যাপদ ৪৪
চারচালা মন্দির ১০৯
চর্যাচর্য বিনিশ্চয় ৪৪
চারু বসু ২০
চিৎপুর ২৬
চিত্তরঞ্জন ৭৭
চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯, ২১
চৈতন্যচরিতামৃত ৪৮-৬৮
চৈতন্যদেব ৪৭, ৬৮, ১৫০ ১৫২
চৈতন্যভাগবত ৪৭-৪৮
চৈতন্যমঙ্গল ৪৭-৪৮
ছৌ নাচ ১০১
জগৎ সিং ২১
জগদীশচন্দ্র বসু ৬১-৬৩
জগন্নাথ মিশ্র ৬৯
জন্মাষ্টমী ১২১
জব চার্নক ২৮
জয়দেব ৪৮
জলদাপাড়া ৭৮
জলপাইগুড়ি ৪, ৫, ৭, ৮
জল্পেশ্বর ৭৪
জামদানী ১৪৮
জারি ৮৭
জালালাবাদ ২২
জালিয়ানওয়ালাবাগ ২১
জোড়-বাংলা মন্দির ১০৯
জৈন ১৩, ১৪, ১৪৯
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ৬৪
জ্ঞানদাস ৪৮
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৪
ঝুমুর ৮৭, ১০৩
টাউন হল ৩৩
টেকচাঁদ ঠাকুর ৫১
ডায়ার, জেনারেল ২১
ডায়মণ্ডহারবার ৭২, ৮৮
ডুয়ার্স ৪
ঢপ গান ৯৩
ঢালি নৃত্য ৯৭, ৯৮, ১০২
তর্জা ৫১
তাঁত শিল্প ১৪৬
তারকনাথ দাস ২০
তারকনাথ পালিত ৬৩
তারকেশ্বর ৬৯
তারকেশ্বর দস্তিদার ২২
তারাপীঠ ৭০
তারিণীচরণ মিত্র ৫০
তাম্রযুগ ৯
তাম্রলিপ্ত ৫৯
তিস্তা ৪, ৬
দক্ষিণেশ্বর ২১, ৬৭
দশনামী সম্প্রদায় ৭০
দামোদর নদ ৬
দার্জিলিং ৪, ৬-৮, ৭৬
দাশু রায় ৫২
দিগম্বর বিশ্বাস ১৬
দিল্লী চলো ২৪
দীঘা ৭৬
দীনবন্ধু মিত্র ১৬, ৫৩
দুর্গাপূজা ৭৮

দুর্গেশনন্দিনী ৫৪
দুলদুল ১২৫
দেওয়ালি ১১৬
দেবনাগরী ৪২
দেবব্রত বসু ১৯
দোম আন্তনিও ৪৯
দোল ১২০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১, ৩, ৫, ৯৬
ধর্মমঙ্গল ৪৬, ৮০
ধর্মলিপি ৩৮
ধাতুর মূর্তি শিল্প ১৪৫
নদী-বিজ্ঞান গবেষণাগার ৬৫
নন্দরাম সেন ৩০
নবদ্বীপ ৬৮, ১৫৩
নববর্ষ ১১৩
নবীনচন্দ্র সেন ৫৬
নব্য-প্রস্তর যুগ ৯, ১১
নরহরি চক্রবর্তী ৬৮
নরেন গোঁসাই ১৯
নরেন ভট্টাচার্য ২০
নরোত্তম দাস ৪৮
নাগর লিপি ৪৩
নামকীর্তন ৯৪
নীল বিদ্রোহ ১৬
নীলরতন ধর ৬৪
নীলের মেলা ৭০, ৮৭, ৯০
নৃতত্ত্ব সমীক্ষা ৬৫
নোবেল পুরস্কার ৬১
নৌকাডুবি ৫৮
নৌ-বিদ্রোহ ২৫
ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৬
পঞ্চরত্ন মন্দির ১০৯
পট শিল্প ১৫৫
পদ্মা ৫
পলাশী ১৫, ৩২, ৫৬
পদাবলী কীর্তন ৯৪
পাঁচালী ৫২
পাট গবেষণাগার ৬৫
পাহাড়পুর মন্দির ১০৬
পালি ৩৬, ৩৮
পি. সি. মিত্র ১৭
পীর মোবারক ১৫৬-৫৭
পুরীমাধব প্রামাণিক ২৩
পুলিনবিহারী দাস ১০, ২০
বাংলাদেশ ৩
পোড়ামাটির বাসন ৯
পোষ্টমাষ্টার ৫৮
প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী ১৭
প্রতাপাদিত্য চরিত্র ৫০
প্রফুল্ল চাকী ১৮, ২০
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৬১, ৬৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৪
প্রমোদ চৌধুরী ২৮
প্রহ্লাদ ১১৮
প্রাকৃত সাহিত্য ৩৭
প্রাণীতত্ত্ব সমীক্ষা ৬৫
প্রিয়দারঞ্জন রায় ৬৪
প্যারীচাঁদ মিত্র ৫১
ফোর্ট উইলিয়াম ২৭, ৩০
বক্রেশ্বর ৭৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ২০
বংশ শিল্প ১৪৬
বঙ্গোপসাগর ৩, ৬
বড়দিন ১২৬
বন্দেমাতরম্ ১৮
বর্গীর হাঙ্গামা ৩১
বরাকরের মন্দির ১০৭
বয়কট আন্দোলন ১৭
বসন্ত বিশ্বাস ২০
বসু বিজ্ঞান-মন্দির ৬৩
বাউল ৭৯, ৮৩
বালেশ্বর ২৮
বামাক্ষ্যাপা ৭১, ১৫২-৫৩
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৮, ১৯
বারেন্দ্রভূমি ৩
বাংলার অধিবাসী—বাঙ্গালী ৯
বাংলার উৎসব ১১২
বাংলার তীর্থক্ষেত্র ৬৬
বাংলার দর্শনীয় স্থান ও বস্তু ৭৫
বাংলার বাউল ৭৯
বাংলার ভাষা ও লিপি ৩৫

বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় ৩
বাংলার মন্দির ১৭৪
বাংলার মেলা ১২৮
বাংলার রাজধানী—কলকাতা ২৬
বাংলার লোকনৃত্য ৯৭
বাংলার লোকসঙ্গীত ৮৬
বাংলার বিজ্ঞান সাধনা ৫৯
বাংলার শিল্পকলা ১৩৮
বালার সংস্কৃতি ১৬০
বাংলার সাধক ১৪৯
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৪০
বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামী ১৫
বিজয় সিংহ ৫৯
বিদ্যাপতি ৩৮, ৪৮
বিন্দুর ছেলে ৫৫
বিজ্ঞান কলেজ ৬৩
বিপিনচন্দ্র পাল ১৬
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ১৭
বিবেকানন্দ ৬৮, ১৫৭-৫৮
বিশ্বযুদ্ধ (১ম) ২০
বিশ্বযুদ্ধ (২য়) ২২
বীরেন দত্তগুপ্ত ২০
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০
বীরেশ চন্দ্র গুহ ৬৪
বুদ্ধদেব ১৩, ৩৮
বেদ ১১, ১৩
বেদসংহিতা ৩৬
বেলগাছিয়া নাট্যশালা ৫২
বেলুড় মঠ ৬২
বোলপুর ৭৭
বোলান গান ৮৭, ৯০
বৈদিক ভাষা ১২, ৩৬
বৌদ্ধধর্ম ১৪৯
বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১৩
বৈষ্ণব পদাবলী ৪৮
ব্ল্যাক জমিদার ৩০
ব্যাণ্ডেল ৭৬
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৬, ১৮
ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ৪৯
ভগীরথ ৭৩
ভাওয়াইয়া গান ৮৬, ৮৭, ৯৫
ভাদু ৮৭, ৯২
ভারত ছাড় আন্দোলন ২২-২৩
ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান সমিতি ৬২
ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি ৬০
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৫
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ৬২
ভাগীরথী ২, ৩, ৫
ভাটিয়ালী গান ৮৭, ৯৩
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৫১
ভোট-চীনা ভাষা ১২
ভোলা ময়রা ৫২, ৯৫
মঙ্গলকাব্য ৪৫
মঙ্গল পাণ্ডে ১৫
মধুসূদন দত্ত ৫৩
মনসামঙ্গল ২৬, ৪৬
মসলিন ১৪৮, ১৫১
মহরম ১২৪
মহাকালী লাখে নাচ ১০০
মহাবীর ১৩
মহেন্দ্রলাল সরকার ৬০
মহানদী ৬
মহানন্দা নদী ৩
মহাভারত ৪৬
মাটির পুতুল ১৪২
মাতঙ্গিনী হাজরা ২৩
মাদুর শিল্প ১৪৩
মায়াপুর ৬৮
মারহাট্টা ডিচ্‌ ৩১
মার্শম্যান ৪৯
মিশরের মমি ১৪৭
মীরকাশিম ১৫২
মীরজাফর ৩২
মাষ্টার-দা ২২
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ২৬
মুকুন্দ দাস ৯৬
মুখোশ নাচ ১০০
মৃৎ শিল্প ১৩৯
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৫০
মেঘনাদ সাহা ৬৪-৬৫
মোবারক গাজী ১৫৬-৫৭
মোহেন-জো-দাড়ো ৪৩
মৌর্য ১৩, ১৪
মৌর্য যুগ ১৪

যজুর্বেদ ৩৭
যতীন্দ্রনাথ দাস ২১
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ২০
যুগান্তর ১৭-১৮
যোগপীঠ ৬২
যোশীমঠ ৭০
রজনীকান্ত সেন ৯৬
রবীন্দ্রনাথ ৩, ১৭, ২১, ৪০, ৫৩, ৭৭, ৯৬, ১৬৭
রমেশচন্দ্র দত্ত ৫৪
রস, রোনাল্ড ৬১
রাজপুত জীবন সন্ধ্যা ৫৪
রাবণ-কাটা নৃত্য ১০১
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৬৮, ১৫৪-৫৬
রামকৃষ্ণ মিশন ৬৮
রামায়ণ ৪৬, ৮৬, ৯৫
রামায়ণ গান ৯৫
রামনারায়ণ তর্করত্ন ৫২
রাম বসু ৫২
রামরাম বসু ৫০
রামপ্রসাদ সেন ৪৮, ৯৫, ১৫-১৫২
রামমোহন রায় ১৬, ৫০, ১৫৩
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৭, ৫১
রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
রায়বেঁশে নৃত্য ৯৭-৯৮, ১০২
রাসবিহারী ঘোষ ৬৩
রাসবিহারী বসু ২০, ২৩
লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ২৩
লোচন দাস ৪৭
শঙ্করাচার্য ৭০
শঙ্খ শিল্প ১৪১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৫
শ্মশান-জ্বালানো নৃত্য ৯৯
শান্তিনিকেতন ৭৭
শান্তিপুর ১৫৩
শারদোৎসব ১১৫
শাক্ত পদাবলী ৪৮
শিবের গাজন ১৪
শিশির মিত্র ৬৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৪৫
শীলভদ্র ৫৯
শৈলেন বসু ১৯
শোলা শিল্প ১০৪
শ্যামা সঙ্গীত ৮৭, ৯০
শ্রীপঞ্চমী ১১৭
সংস্কৃত ৩৭, ৩৮
সগর রাজা ৭২
সাগর দ্বীপ ৪
সধবার একাদশী ৫৩
সতীশচন্দ্র মজুমদার ৬৫
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৫
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯, ৬৪
সন্ধ্যা পত্রিকা ১৮
সমুদ্রনাথ গিরি ৭০
সরস্বতী পূজা ১১৭
সাবর্ণ চৌধুরী ২৮, ২৯
সাম বেদ ৩৭
সারদা মঠ ৭০
সাহা ইনষ্টিটুট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ৬৫
সিপাহী-বিদ্রোহ ১৫
সিদ্ধার্থ ১২২
সিরাজউদ্দৌল্লা ৩২
সুতানুটি ২৬, ২৭, ২৮
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২১
সুন্দরবন ৪, ৭৮
সুভাষচন্দ্র বসু ২১, ২২, ২৩, ২৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
সূর্য সেন ২১, ২২
সোনার তরী ৫৭
স্কুল অভ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ৬৫
স্বদেশী আন্দোলন ১৫
স্বাধীনতা আন্দোলন ১৫
স্বরাজ্য দল ২১
হরপ্পা লিপি ৪১
হরু ঠাকুর ৫২, ৯৫
হাউরে গোঁসাই ৮৫
হাজার দুয়ারী ৭৭
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ২০
হিউয়েন সাঙ ১৪, ৭৫
হিমালয় ২, ৬
হিন্দুমেলা ১৬
হেমচন্দ্র কানুনগো ১৮, ১৯
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬
হোলি ১১৮

विद्या भारती

Rs 15·00